ব্যাবিলন কথকতা

তৃতীয় সংখ্যা
১৬ই ডিসেম্বর ২০০৮

ব্যাবিলন গ্রুপ

সম্পাদকঃ
এমদাদুল ইসলাম

আহ্বায়কঃ
মুহাম্মদ সাইফুল হক

প্রচ্ছদ ও ডিজাইনঃ
স্বাধীন খান
মোস্তফা কামাল

সহযোগিতায়ঃ
ব্যাবিলন পরিবার

মুদ্রণেঃ
অক্ষর প্রিন্টার্স
১৪, কাটাবন, ঢাকা।
৮৬২২৯০১, ০১৫৫২৩৭৪৫৮৪

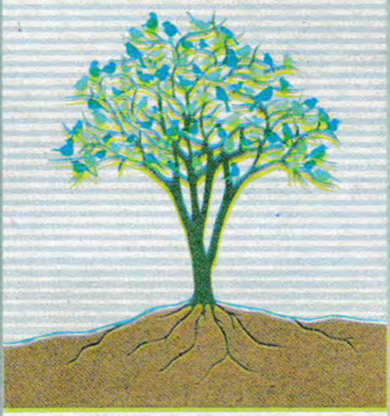

সূচীপত্র

পরিচালকবৃন্দের শুভেচ্ছা বাণী		২
সম্পাদকীয়		৩
স্মৃতি কথা	মুহাম্মদ শিমুল	৫
কথকতা	শফিকুল ইসলাম (সবুজ)	৫
কবর	মোঃ গোলাম মোস্তফা	৬
অন্য কেউ নয়	মোঃ রিয়াজুল ইসলাম (রিপন)	৬
অনাথ	মুহাম্মদ শহীদুল ইসলাম	৭
কাজী নজরুল	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	৭
ব্যাবিলনের কত কথা	মোঃ রাজু	৭
আধুনিক প্রযুক্তির ছোঁয়ায় পোশাক শিল্প	উম্মে সালমা ডালিয়া	৮
প্রাণী কূলের আবেগের গল্প	সোহেলী সুরাইয়া ছাদেক	১০
অলঙ্কার	বীর বাহাদুর (মিজান)	১২
ক্যান্সার প্রতিরোধে দই	ডাঃ বিকাশ সরকার	১৫
গার্মেন্টস শিল্পের বিকাশ - বাংলাদেশ প্রেক্ষিত	মোহাম্মদ হাসান	১৬
আনলাকী থার্টিন যদি লাকী হয়!	মুহাম্মদ সাইফুল হক	১৯
স্বপ্ন ছোঁয়ার স্বপ্ন	এ,কে,এম, গোলাম মহ্‌ী চৌধুরী	২১
দিশে হারা প্রেম পত্র	মোঃ ইউনুছ আলম (স্বপন)	২৩
কোন এক হোটেলে	নিজাম খান	২৩
আদর্শ গার্মেন্টস ব্যাবিলন	মোঃ শাহীন রেজা	২৪
গল্প লেখার গল্প	এমদাদুল ইসলাম	২৬
আমার বাংলা	মরিয়ম ফারহাজ	২৮
কবিতা তুমি	মঞ্জুরুল করিম	২৮
বন্ধু একা নও	শরীফা আক্তার ঝর্ণা	২৮
স্বাধীনতা	আব্দুল হামিদ	২৯
পাওয়া	হামিদা ফেরদৌস (জিসান)	২৯
সবুজ ঘেরা গাঁও	মোঃ মিন্টু মিয়া	২৯
আমার ইচ্ছে	মোঃ ফরহাদ হোসেন	৩০
তুমি কি চাওনা	তানিয়া আক্তার (পান্না)	৩০
হারানো দিন	মোঃ মোক্তার হোসেন	৩০
ব্যাবিলন গ্রুপের বিবিধ কার্যক্রমের ছবি		৩১

পরিচালকবৃন্দের শুভেচ্ছা বাণী

মইনুল আহসান
পরিচালক
অর্থ ও হিসাব

এমদাদুল ইসলাম
পরিচালক
বিপণন ও মান নিয়ন্ত্রণ

নিসার আহমেদ
পরিচালক
আমদানি ও প্রশাসন

আবিদুর রহমান
পরিচালক
রপ্তানী

আব্দুস সালাম
পরিচালক
উৎপাদন

'ব্যাবিলন কথকতা' - এর তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশের খবর আমাদেরকে খুব আনন্দ দিয়েছে। ২০০৮ ছিল ব্যাবিলন পরিবারের সবার জন্য বেশ টানাপড়েনের বছর। এর মধ্যে পত্রিকা প্রকাশ উৎসব অব্যাহত রাখা একধরনের বিলাসিতাই মনে হয়। তারপরও সারা বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর বছরের প্রান্তে এসে ব্যাবিলন পরিবারের সদস্যরা তাদের স্বরচিত বা কোন সহকর্মী রচিত রচনা সম্ভারে সমৃদ্ধ 'ব্যাবিলন কথকতা' যখন হাতে পান তখন বোধ হয় তাদের বছরের সব ক্লান্তি মুছে যায়। এক ধরনের তৃপ্তি ও প্রশান্তিতে যেন মন ভরে যায় সবার। তখন সেই আনন্দের সাথে আমরাও শরিক হয়ে যাই।

'ব্যাবিলন কথকতা' - এর নেপথ্য কর্মীবৃন্দ, সকল লেখক-লেখিকা, ব্যাবিলন পরিবারের সকল সদস্য-সদস্যা এবং ব্যাবিলনের বাইরে থেকে যারা আমাদেরকে সব সময় সমর্থন ও উৎসাহ দিয়ে আসছেন তাদের সবাইকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ।

সম্পাদকীয়

স্বস্তির একটা গাঢ় নিঃশ্বাস ফেলে 'ব্যাবিলন কথকতা' - এর তৃতীয় সংখ্যার সম্পাদকীয় লিখতে বসেছি। স্বস্তি বলছি কারণ অস্বস্তি, অনিশ্চয়তা ও শঙ্কা প্রচুর ছিল এবার।

নানা কারণে ২০০৮ সন ব্যাবিলন পরিবারের জন্য মসৃন ছিলনা শুরু থেকেই। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব্যাবসানুকূল থাকলেও সম্প্রতি সামগ্রিক বিদ্যুৎ জোগান ব্যবস্থা এতটাই খারাপ হয়েছে যে এ সম্পর্কে আর ভেঙ্গে চুড়ে বলার কিছু নেই। সবাই যেখানে ভুক্তভোগী সেখানে আলাদা করে ব্যাবিলনের কথা বলাটা বাড়াবাড়ি মনে হতে পারে। তবু না বলে পারছিনা দেশে গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংকটের পাশাপাশি বিশ্বব্যাপি বিরাজমান অর্থনৈতিক মহামন্দা সবার সাথে আমাদের ব্যাবিলনের জীবনকে কঠিনভাবেই ছুঁয়েছে।

১৯৮৬ সাল থেকে ব্যাবিলন সদস্যদের কঠোর শ্রম ও সাধনার ফসল হিসেবে তিলে তিলে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠানটি সময়ের ব্যাবধানে ব্যাপ্তি ও পরিচিতি পেয়েছে ব্যাতিক্রমী একটি বিজনেস গ্রুপ হিসেবে। পেয়েছে বিদেশী ক্রেতা ও দেশীয় স্বগোত্রিয় প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছ থেকে সুকীর্তির স্বীকৃতি ও প্রশংসা। এই অর্জনে আত্মতুষ্টির ঢেকুর উঠে আসা অস্বাভাবিক নয় কিন্তু ব্যাবিলন পরিবারের জন্য তা অনাকাংখিত।

বছরের শুরুতেই আমরা ব্যাবিলনের দেহাভ্যন্তরে সুক্ষ্ম রক্তক্ষরনের ব্যথা অনুভব করতে থাকি। অতীত সাফল্যের অহংবোধ আমাদেরকে পলে পলে আত্মহননের পথে ঠেলে দিচ্ছিলো - বুঝতে পারি বেশ। তবে সুখের কথা হলো বড়সড় কোন দুর্যোগের অনলে দাহ হবার আগেই আমরা সম্বিত ফিরে পাই। সাড়া পড়ে যায় ব্যাবিলন ব্যবস্থাপনার সর্বস্তরে খুব দেরী হয়ে যাবার আগেই। বোধোদয়ের পর থেকে আজ অব্দি চলছে অস্তিত্ব রক্ষার ও আরো ভালো করার নিরন্তর লড়াই। এই লড়াইয়ের সৈনিক - সেনাপতি ব্যাবিলনের সবাই। আর এটাই আমাদের সবার গর্ব।

সে কারনেই ভাবনা ছিল খুব। দুর্ভাবনা বলা যায়। প্রতি মুহূর্তে সংগ্রামরত সৈনিকদের ফুরসত কোথায় 'ব্যাবিলন কথকতা' কে টিকিয়ে রাখার ? বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে গুরুত্বের তালিকায় পত্রিকা প্রকাশের অবস্থান কোথায় তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু ব্যাবিলন সৈনিক বলে কথা। আন্তরিক ভাবে চাইলে এরা প্রায় অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে। করেছেও অনেকবার অতীতে। এবারের সংখ্যাটি তার আরেকটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ব্যাবিলন যোদ্ধাদেরকে সাবাশ !

চলতি বছরটি দুর্যোগ ও সংগ্রামের বছর হলেও এ বছরের প্রাপ্তিও আমাদের খুব ফেলনা নয়। এ বছরই আমরা সাভারের হেমায়েতপুরে প্রতিষ্ঠা করেছি একটি কমিউনিটি ক্লিনিক ও হাসপাতাল। স্থানীয়রা ব্যাবিলন মেডিক্যাল সেন্টার থেকে সুলভে নানান চিকিৎসা সুবিধা নিতে পারছেন।

ঈদুল ফিতর –এর আগে আমরা ব্যাবিলনের মূল ভবনের সাথে ব্যাবিলন গ্রুপের শার্ট ফ্যাক্টরির সকল সদস্য, সদস্যার জন্য প্রতিষ্ঠা করেছি 'ন্যায্য মূল্যের দোকান'। এই Fair Price Shop থেকে ব্যাবিলন কর্মীরা বাজার দর থেকে উল্লেখযোগ্য হারে সুলভে কিনতে পারছেন চাল-ডাল-তেল-নুনের মত নিত্যপ্রয়োজনীয় পন্যাদি। অদুর ভবিষ্যতে হেমায়েতপুর অঞ্চলেও চালু করা হবে এই উদ্যোগ। আশা করি ২০০৯ সনে আমরা Corporate Social Responsibility-এর আরো নতুন নতুন উদ্যোগের বাস্তবায়ন দেখতে পাবো ব্যাবিলন পরিবারের কাছ থেকে।

চলতি সালের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল "Dream Kidz" এর জন্ম। আমাদের Retail Brand Trendz নিয়ে এলো Dream Kidz কে দেশের শিশু-কিশোর-কিশোরীদের হাল ফ্যাশনের পোষাক চাহিদা পূরনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে।

এবার ধন্যবাদের পালা। ব্যাবিলনের পরিচালকবৃন্দ, সর্বস্তরের ব্যবস্থাপনায় সকল কর্মকর্তাবৃন্দ, কর্মচারী ও কর্মী বাহিনী সবাইকে সীমাহীন ধন্যবাদ। এদের অসাধারণ সহযোগীতা আর ম্যাগাজিন কমিটির সকল সদস্য-সদস্যার নিরলস পরিশ্রমের যুগ্ম ফসল হল ব্যাবিলন কথকতা।

ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের সকল ক্রেতা, ক্রেতা প্রতিনিধি ও সাপ্লাইয়ারদেরকে যাদের অনুপ্রেরণা আমাদেরকে গতি দান করে সব সময়।

পরিশেষে আশা করব এবারের সংখ্যার লেখা পড়ে 'ব্যাবিলন কথকতা'-এর পাঠক-পাঠিকারা হয়তো আমাদের সাথে একমত হবেন যে পত্রিকাটি ক্রমশঃ তার গন্তব্যে এগুচ্ছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে লেখক-লেখিকা তৈরীর একটা প্রকল্প আমাদের ছিল। লেখার সার্বিক ও ক্রমঃ মানোন্নয়ন সেই প্রকল্পের অন্তঃত আংশিক বাস্তবায়নের ইংগিত দেয়। আমাদের ধারনা এমনটাই।

মহান বিজয় দিবস ও New Year 2009 – এর শুভেচ্ছা রইল সবার জন্য।

এমদাদুল ইসলাম
পরিচালক, বিপণন ও মান নিয়ন্ত্রণ
তারিখ : ১৬ই ডিসেম্বর, ২০০৮

স্মৃতি কথা

মুহাম্মদ শিমুল
সহকারী ব্যবস্থাপক, এইচ.আর.ডি, ব্যাবিলন গ্রুপ

কিছু কিছু স্মৃতি থাকে যা মানুষকে আনন্দ দেয় আবার অনেক স্মৃতি মানুষকে দুঃখও দেয়। সে রকম একটি আনন্দময় স্মৃতিচারণের কথাই আজ সবাইকে জানানোর চেস্টা করছি।

অডিট টিমের সাথে যুক্ত থাকার ফলে দেশের অনেক গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীতে যাওয়ার সুযোগ আমার হয়েছিল। এরই সুবাদে (সময়টা সম্ভবতঃ ২০০৭ সালের মার্চ মাসের কোন একদিন হবে) ব্যাবিলন গার্মেন্টসে এসেছিলাম WRAP এর অডিট টিমের সাথে । পরপর দুইদিন অডিট করার পর যখন ব্যাবিলন থেকে বিদায় নিচ্ছিলাম ঠিক তখনই একজন শ্রদ্ধেয় ম্যানেজার স্যার আমাকে একটি ম্যাগাজিন উপহার দিয়েছিলেন । আমি সেটা নিয়ে বাসায় গেলাম এবং অবসরে বসে পড়লাম । ম্যাগাজিনটি পড়ে আমি অভিভূত হয়ে গেলাম । সত্যি বলতে কি আমার এত ভালো লাগলো যে আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না । কারণ চাকরির প্রয়োজনে আমি অনেক গার্মেন্টস কারখানা পরিদর্শন করেছি কিন্তু কোথাও এ রকম কোন ম্যাগাজিন দেখিনি যা কিনা সাধারণ শ্রমিক হতে শুরু করে মালিক পর্যন্ত সবার কাছে থেকে লেখা সংগ্রহ করে প্রকাশ করে ।

যা হোক, ম্যাগাজিনটি পড়ে ভেবেছিলাম যে এই "ব্যাবিলন কথকতা"-এর পরবর্তী সংখ্যাটি আর পড়তে পারবো কিনা । কিন্তু সত্যিই আনন্দের বিষয় হলো যে "ব্যাবিলন কথকতা"-এর দ্বিতীয় প্রকাশনার মোড়ক উন্মোচনের সময় (১৫ই ডিসেম্বর' ০৭) আমি নিজেই ব্যাবিলনের একজন সদস্য হিসেবে সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম । তখনই আমি চিন্তা করলাম আমার এই আনন্দময় স্মৃতিটুকু সবার সাথে উপভোগ করার কথা । তাই আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস । আমার মতো আর যাদের মনে এই পত্রিকাটি দাগ কেটেছে তাদের সবাইকে নিয়ে আমি এই পত্রিকার সর্বাঙ্গীন মঙ্গল এবং উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি ।

কথকতা

শফিকুল ইসলাম (সবুজ)
জুনিয়র অফিসার, ট্রান্সপোর্ট, হেড অফিস

সেই ১৯৯৪ সন থেকে সম্পৃক্ত আছি ব্যাবিলনে। ১৯৯৪ থেকে ২০০৮ অনেক গুলো দিন ও মাস, সব মিলিয়ে ১৫টি বছর পার করতে চললাম । বিগত দিনগুলো কত বিড়ম্বনা কত আনন্দ সুখে বিজড়িত ছিল । এখন আরও বেশী কাজের বিড়ম্বনায় থাকতে হয়। তারপরেও অনেক ভালো আছি, কারন যাদের অনুপ্রেরণায় সারাক্ষণ আমি অনুপ্রাণীত- ভালো তো থাকতে হবে । কেননা পিতৃতুল্য স্যারগণ সকল বিপদে আপদে পরামর্শসহ সবধরনের সহযোগিতা করেছেন আমায় । সর্বদা নিজ সন্তানের ন্যায় আমাকে আপন স্নেহে লালিত করেছেন । যার জন্য এতটা পথ আজ পাড়ি দিতে সক্ষম হয়েছি, পেরেছি আমি নিজেকেও বিলীন করে দিতে ব্যাবিলন হ্যাভেনে । ব্যাবিলনের সাথে অঙ্গা-অঙ্গি ভাবে জড়িত আমি, আপনি, ব্যাবিলন পরিবারের সকলে । আমি তো এভাবেই থাকতে চাই আজীবন, এই স্বর্গের সাথে মিলিত হয়ে । যেখানে সকল হৃদয়ের মিলন মেলা বসে প্রতিদিন, প্রতিক্ষন । সেখান থেকে নিজেকে কখনো আলাদা ভাবা সম্ভব নয় । ব্যাবিলন স্বর্গের মাঝে আজ সকলের এমন বসবাস যেমন চোখের সাথে তার পাতার । তাই কোন অবস্থাতেই এই স্বর্গের মহামেলা থেকে নিজেকে সরাতে চাইনা আমি । কিন্তু আপনি........?

কবর

মোঃ গোলাম মোস্তফা
স্টোর কিপার, সাব স্টোর, পিন নং-৮১১৬
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিঃ

একে একে ছিঁড়ে দিয়ে সকল বাঁধন,
আমিও তো চলে যাব বাবারই মতন।
পড়ব লুটিয়ে ঐ কবরের গায়,
সে দিন ভুলেও কেউ খুঁজোনাগো আমায়।

নোঙ্গর বিচ্ছিন্ন ঐ তরী হল কূল,
আমার বিরহে যেন কেউ না হয় ব্যাকুল।
ঝড়া পাপড়ির মত যেই যাব ঝরে,
পিছনের মায়া সব পিছে রবে পড়ে।

আমি আর সেই দিন থাকব না ফুল,
খুলে যাবে চোখ আর ভেঙ্গে যাবে ভুল।
কান্নার উদ্যোগ করিও না কেউ,
দুঃখের নদীতে কেউ তুলিও না ঢেউ।

এই কূলে আমি আর ভেড়াবো না তরী,
জমবে না আসর আর সেই আহামরী।
সেই দিনও সাঁঝের পাখি ডেকে যাবে সাঁঝে,
আমি শুধু থাকবো না তোমাদেরই মাঝে।

সূর্যোদয় সূর্যাস্ত সবই রবে ঠিক,
হারাবে কেবল এই অচেনা পথিক।
কোকিলের কুহু কুহু সুরের মতন,
রাতের আঁধার যদি করে থমথম।

সেই রাতে তোমাদের আমি সেথা নাই,
সেই কথা ভেবে ভেবে বুকে ব্যথা পাই।
পদচিহ্ন রেখে পথে দূর অজানায়
স্মৃতি রেখে চলে যাব কবরের ঠিকানায়।

অন্য কেউ নয়

মোঃ রিয়াজুল ইসলাম (রিপন)
সিনিয়র অপারেটর, পিন নং-৩৯৭
জুনিপার এমব্রয়ডারিজ লিঃ

অন্য কেউ নয় শুধু তুমি ব্যাবিলন
একটি মোমবাতি হয়ে চিরদিন জ্বলবে
আমার হৃদয় মন্দিরে
শুধু তুমি ব্যাবিলন।

অন্য কেউ নয়, অন্য মুখ নয়, অন্য চোখ নয়
ভিন্ন হতে নয়, শুধু তোমার দেহলতা রসাল
জড়িয়ে চিরদিন হয়ে রবে স্বর্ণলতা
শুধু তুমি ব্যাবিলন
না পাওয়ার ধন,
আমার পৃথিবীর রত্ন অনন্ত আকাশে
হাজারো তারার ভীড়ে, শুধু একটি চাঁদ তুমি,
শুধু তুমি ব্যাবিলন।
জলাঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা পদ্ম পুকুরে
ফুটন্ত লাল গোলাপ তুমি।
তোমার অফুরন্ত রূপ সৌন্দর্য্য
রূপালী নদীর জলের মতন।
সন্ধ্যার আকাশে রঙধনুর মতন।
শুধু তুমি ব্যাবিলন,
শুধু তুমি ব্যাবিলন।

অনাথ

মুহাম্মদ শহীদুল ইসলাম
সিনিয়র অফিসার, মার্চেন্ডাইজিং
হেড অফিস

বাবা গেছেন জন্মের আগে
দেখিনি বাবার মুখ,
মাকে হারিয়েছি শিশুকালে
বুক ভরা মোর দুখ।

বাবার আদর পাইনি আমি
মা ছিল মোর সোহাগিনী,
মায়ের আদর ভালোবাসায়
বাবার অভাব কভু বুঝিনি।

মাও আমায় ফেলে গেল
আশার আলো সব ফুরাল,
মা চলে গিয়ে মোরে
করে গেল একা,
এখন আমি একটুকুও
পাইনা সুখের দেখা।

দুঃখ, কষ্ট, গ্লানি ও দহন
করতে হবে আমায় বহন,
দুঃখের বোঝা মাথায় নিয়ে
করেছি যে আমি জন্ম গ্রহণ।

আমি এক এতিম অনাথ
দিও না ভাই আমায় আঘাত,
একটু আদর ভালবাসা শুধু আমি চাই।
এর চেয়ে যে বেশী কিছু
চাওয়ার আমার নাই।

কাজী নজরুল

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
কিউ.সি, ফিনিশিং, পিন নং-২০৯৩
সুরভী গার্মেন্টস লিঃ

চুরুলিয়া গ্রামে
দুখু মিয়া নামে
ফুটে ছিলো কোন ফুল,
কাজী নজরুল।

খুলে মন প্রাণ
গাইতো কত গান,
যেন এক বুলবুল
কাজী নজরুল।

শোষকের গায়ে
কলমের ঘায়ে,
কে ফুটাতো হুল ?
কাজী নজরুল।

সকলের হৃদয়েতে
চিরদিন রবে গেঁথে
তাতে নেই কোন ভুল,
কাজী নজরুল।

ব্যাবিলনের কত কথা

মোঃ রাজু
আয়রন ম্যান, পিন নং-১৫১৯
অবনী ফ্যাশন্স লিঃ

ব্যাবিলনের শ্রমিক মোরা
আছি অনেক সুখে,
জীবন মোদের ধন্য হল
তারই সাথে থেকে।

সকাল হলে ছুটে চলি
ব্যাবিলনের দিকে,
সবাই মিলে কাজ করি তাই,
হাসি সবার মুখে।

বায়ার যখন ব্যাবিলনে
আসেন বিদেশ থেকে,
খুশি হয়ে কাজ দিয়ে যান
পরিবেশটা দেখে।

দুঃখে গড়া জীবন যাদের
এই যে দুনিয়ায়,
ব্যাবিলনে এসে তারা
সুখের দেখা পায়।

কাজের জন্য আসে সবাই
ব্যাবিলনের গেটে,
ব্যাবিলনে শান্তি আছে
সন্দেহ নেই মোটে।

আধুনিক প্রযুক্তির ছোঁয়ায় পোশাক শিল্প

উম্মে সালমা ডালিয়া
ডেপুটি ম্যানেজার, প্যাটার্ন

১৯৯৬ সালের প্রথম দিকে যখন আমি প্রথম পোশাক শিল্প জগতে প্রবেশ করি তখন এই পোশাক শিল্পে তেমন কোন আধুনিকতার ছোঁয়া লাগেনি। তখনি আমি প্যাটার্ন সেকশনে ট্রেনিং করার জন্য জয়েন করি। প্রথম অবস্থায় মনে হয়েছিল আমি কোনদিন প্যাটার্ন শিখতে পারব না । কেননা ঐ সময়ে এই সেকশনের তদানিন্তন সবাই এই আশংকাই করতেন। আমি মেয়ে তাই তাদের ধারনা ছিল মেয়েরা কখনও এই জাতীয় টেকনিক্যাল ব্যাপার বুঝতে পারবে না। উল্লেখ্য যে, সে সময়ে প্যাটার্ন শিক্ষার পদ্ধতি এত আধুনিক ছিল না। প্যাটার্ন এবং গ্রেডিং ম্যানুয়ালী করতে হত। এতে, এক সেট প্যাটার্ন প্রডাক্শন উপযুক্ত করতে অনেক সময় লাগত।

সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে সব কিছুরই পরিবর্তন হয়। তেমনি পরিবর্তন হয়েছে আমাদের পোশাক শিল্পের প্যাটার্ন প্রযুক্তির । আর এই পরিবর্তিত প্রযুক্তির নাম CAD । CAD– এর পুরো অর্থ হচ্ছে Computer Aided Design । যদিও CAD প্রযুক্তি ব্যয়বহুল কিন্তু এর কার্যকারিতাও অনেক ব্যাপক। ম্যানুয়ালী যে সব কাজ করা অসম্ভব CAD এর মাধ্যমে তা অল্প সময়ে দ্রুততার সাথে প্রায় নিখুত ভাবে সম্পন্ন করা যায়।

১৯৯৬ সালে একজন মাননীয় পরিচালক আমাকে CAD সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন এবং আমাকে Computer সম্বন্ধে ভালভাবে ধারণা নেওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন। তখন আমি মনে করেছিলাম এটা কি আদৌ সম্ভব যে, Computer–এর মাধ্যমে প্যাটার্ন তৈরী এবং গ্রেডিং করা যায়, এমনকি মার্কারও করা যায়। যার বাস্তবতা হচ্ছে যে, ২০০১ সাল থেকেই ব্যাবিলন CAD ব্যবহার করছে। এর মাধ্যমে প্যাটার্নের সবগুলো কাজ খুব সহজে অল্প সময়ের মধ্যে করা যায়। CAD আসার আগে আমরা যেমনভাবে কাগজ কেটে প্যাটার্ন এবং গ্রেডিং করতাম, ঠিক সেভাবেই CAD–এ সবকিছু করা যায় খুব দ্রুততার সাথে ।

হাতে কাগজ কেটে একসেট প্যাটার্ন বানাতে সময় লাগত দেড় থেকে দু ঘন্টা–স্টাইল ভেদে। কিন্তু সেই একই প্যাটার্ন CAD–এ করতে সময় লাগে বিশ থেকে ত্রিশ মিনিট। আর একসেট প্যাটার্ন গ্রেডিং করতে সময় লাগে মাত্র দশ থেকে পনের মিনিট । ম্যানুয়াল প্যাটার্নে আমরা যা যা করতে পারি তার সব কিছুই CAD এ করা যায় খুব সূক্ষ্মভাবে । যারাই প্যাটার্ন এর সাথে সম্পৃক্ত বা যাদের প্যাটার্নের জ্ঞান আছে তারা যদি একবার CAD শিখে ফেলেন তাহলে অবশ্যই তারা আমার সাথে একমত হবেন এবং CAD ছাড়া তারা কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন না । CAD–এ কাজ করার জন্য প্রথমতঃ ম্যানুয়াল প্যাটার্ন বানানো এবং গ্রেডিং এর ভালো জ্ঞান থাকতে হবে । তা না হলে কোন ভাবেই ভালোভাবে CAD আয়ত্ত্ব করা সম্ভব না ।

CAD–এ আমরা শুধু প্যাটার্নের কাজই করিনা সেই সাথে Marker ও করি । মার্কার ম্যানদের যে মার্কার হাতে করতে আড়াই থেকে তিন ঘন্টা সময় লাগে সেটা CAD -এ করতে সময় লাগে সাধারণত ত্রিশ থেকে চল্লিশ মিনিট। যদিও স্টাইল ভেদে সময়ের হেরফের হয়। এছাড়াও অনেক অল্প সময়ে মার্কার বার বার পরিবর্তন করে Consumption save করা যায় । যা কিনা হাতে করা খুবই সময় সাপেক্ষ ব্যপার ।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমাদের ক্রেতাদের চাহিদাও বেড়ে গেছে । এই জন্য ক্রেতারা আগের মত বেশিদিন সময় দেন না কোন Order এর জন্য । বিশ্বের সবকিছুই চলছে দ্রুততার সাথে। তাই এই সেক্টরটিকেও যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হচ্ছে । সে জন্যই প্রয়োজন নতুন নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার । যার সাহায্যে অল্প সময়ে এবং সঠিক ভাবে ক্রেতাদের চাহিদা সম্পন্ন করা যায় । আগে অনেক Buyer আমাদেরকে Paper Pattern পাঠাতেন, এটা ছিল অনেক সময় সাপেক্ষ ব্যাপার । কিন্তু এখন ই-মেইলের মাধ্যমে dxf format-এ Pattern পাঠালে খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমরা সেটা পেয়ে যাই ।

আমাদের এখানে আমরা সাধারণতঃ একটা সাইজের প্যাটার্ন ম্যানুয়াল তৈরী করে তারপর স্যাম্পল তৈরী করি । এভাবে Sample যখন Buyer Approved করে দেয় তখন আমরা Pattern set digitize করে CAD-এর অন্তর্ভূক্ত করি এবং তা বিভিন্ন সাইজে Grading করি । এর পর প্যাটার্ন পুরো সেট বের করে সংশ্লিষ্ট প্যাটার্ন মাস্টার এবং প্যাটার্ন চেকার ভালো করে চেক করে দেয় যেনো প্রডাক্শনে কোন ভুল না হয় । অতি সাম্প্রতিক কালে আমাদের কোম্পানি Decision নিয়েছে যে ম্যানুয়াল কোন প্যাটার্ন কেউ আর তৈরী করতে পারবে না । সেই লক্ষ্যে প্যাটার্ন সংশ্লিষ্ট সকলকে আলাদা Computer দেয়া হয়েছে । ইতিমধ্যে যারা নিজস্ব ডেস্কে Computer পেয়েছে তারা Computer-এ Pattern করা শুরু করে দিয়েছে । এটা যদি সম্পূর্ণভাবে চালু করা যায় তাহলে আমি মনে করি আমাদের কাজ অনেক কম সময়ের মধ্যেই খুব সহজে সম্পন্ন করতে পারব । CAD-এর এমনতরো ব্যাপক ব্যবহারে সময়ের সাথে সাথে অর্থের সাশ্রয় হবে অনেক ।

বছর দুয়েক আগে একটা টেকনিক্যাল সেমিনারে অংশ গ্রহণের জন্য চীন দেশে যাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সেখানে আমি CAD এর আরেকটি নতুন Software দেখেছিলাম। এই Software এর মাধ্যমে যে কোন ডিজাইনের প্যাটার্ন তৈরী করার পর সেটার Fit ঠিক আছে কিনা তা দেখার জন্য এর ভেতরে Virtual মডেল আছে। অটোমেটিকভাবে মডেলের গায়ে সেই প্যাটার্ন দিয়ে ড্রেস তৈরী করে পড়িয়ে তাৎক্ষনিকভাবে ফিটিং ঠিক আছে কিনা তা দেখা যায়। এছাড়া ফ্যাশন ডিজাইনেও এর গুরুত্ব অনেক, কেননা এই CAD এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট Measurement এর Pattern তৈরী করে এই Pattern দিয়ে পোশাক তৈরী করে মডেলের গায়ে পড়িয়ে বোঝা যায় যে, এই ড্রেসটি Stripe Fabric হলে বেশি সুন্দর লাগবে, না Check দিয়ে তৈরী করলে সুন্দর লাগবে, না Print দিয়ে তৈরী করলে সুন্দর লাগবে, না Fabric bias করলে সুন্দর লাগবে। এগুলো CAD এর মাধ্যমে মডেলকে পড়িয়ে খুব অল্প সময়ে সুক্ষ্মভাবে ডিজাইন করা যায়। এই Software টি বেশি কাজে লাগে লেডিস গার্মেন্টস এর ক্ষেত্রে কারণ লেডিস গার্মেন্টস এর Fitting ঠিক রাখা খুবই জরুরী । সেক্ষেত্রে Sample তৈরী না করে CAD এ বসেই ফিটিং চেক করা যায় এবং প্যাটার্ন Correction তাৎক্ষনিকভাবে করা যায়। যদিও এই Software এখনও আমাদের কোম্পানীতে নেই, কিন্তু আমি আশা করি ভবিষ্যতে আমাদের কোম্পানীও এ প্রযুক্তি ব্যবহার করবে।

প্রাণী কূলের আবেগের গল্প

সোহেলী সুরাইয়া ছাদেক
জুনিয়র অফিসার, হেডঅফিস

মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসা চিরন্তন। মা-বাবা তাদের সন্তানকে, ভাই তার বোনকে বা বন্ধুর জন্য বন্ধুর ভালবাসা-প্রয়োজনে একের জন্য অপরের আত্মত্যাগের ইচ্ছা বা বাস্তবিক আত্মত্যাগের উদাহারণের অভাব নেই। নিজের জীবন দিয়ে আপন সন্তানের জীবন বাঁচাবার চেষ্টা, বন্ধুর জন্য বন্ধুর জীবন বাজী রাখা – এমন ঘটনার কথা আমরা প্রায়ই শুনে থাকি। তবে আপনজনদের প্রতি আমাদের যে টান বা ভালবাসা তার চেয়ে নিজেদের প্রতি আমাদের ভালবাসা কি কম? বরং অনেক বেশি। তাই না? স্বাভাবিক অবস্থায় অন্যের জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করা বা আত্মাহুতি দেয়া প্রায় অসম্ভব চিন্তা। নিজেকে প্রশ্ন করে দেখুন কি উত্তর পান। আত্মহত্যা করা বা অন্যের জন্য নিজের জীবন দান করা – বিষয়টা ভাবতেও আতংকিত হয়ে যাই আমরা।

কিন্তু তারপরও এই রূপ, রস ও সুধায় ভরা রঙিন পৃথিবীটার মায়া ছেড়ে, নিজের সব স্বপ্ন, সাধ-আহলাদকে উপেক্ষা করে মানুষ অন্যের জন্য, প্রিয়জনের জন্য সবকিছু বিসর্জন দেয় এবং জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পরপারে চলে যায়। এমন পারাটা খুবই অসাধারণ ! কি শক্তি বলে মানুষ তা পারে ? জগতে সবচে মূল্যবান, সবচে প্রিয় নিজের জীবনের মায়া কাটাবার জন্য নিশ্চই চাই প্রচন্ড মানসিক শক্তি, অসাধারণ মনোবল। কোত্থেকে আসে মৃত্যু ভয়কে জয় করার সেই শক্তি ?

বিজ্ঞানীরাও এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন। সৃষ্টির সেরা ও সবচে বুদ্ধিমান জীব মানুষ। মানুষের পক্ষে অনেক কিছুই সম্ভব হয়েছে। জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতি কে করেছে ? এই মানুষইতো ! কাজেই আমার মনে হয় ভীষন বুদ্ধিমান, অসাধারণ কল্পনা শক্তিধর ও প্রবল আবেগ ধারনে সক্ষম মানুষের পক্ষে আত্মবিসর্জনের মাধ্যমে নিজেকে মহিমান্বিত করা তেমন অসাধারণ কোন ব্যাপার নাও হতে পারে।

কিন্তু মানুষের বুদ্ধি বৃত্তির সাথে কোন রকম তুলনাই হয় না এমন কিছু নিম্নশ্রেনীর প্রাণীর মধ্যেও যে এমনতরো আত্মদানের নজির পাওয়া যায় তার কি ব্যাখ্যা ? বিজ্ঞানীরা গবেষনা করেছেন বিষয়টা নিয়ে। আমি Zoology এর ছাত্রী হওয়ায় Ethology নামে বিজ্ঞানের এই শাখাটির সাথে আমার কিঞ্চিত পরিচিতি ঘটেছে। নিম্নশ্রেনীর প্রাণীদের মন, মেজাজ, আবেগ, আচার-আচরণ – এই সব নিয়ে গবেষনাই Ethology-এর কাজ।

মানুষ যেমন সারাজীবন ধরে তার স্নেহ-ভালবাসা-মমতা ধরে রাখতে পারে তার সন্তান ও প্রিয়জনদের জন্য নিম্নশ্রেনীর প্রাণীরা অবশ্য তেমনটি পারে না। এদের মধ্যে সাধারণতঃ সন্তান জন্মানোর আগে আগে সন্তান বাৎসল্য পরিলক্ষিত হয় যা সন্তান কিছুটা বেড়ে উঠা পর্যন্ত থাকে। এছাড়াও কোন কোন প্রজাতির প্রানীদের মধ্যে দলবদ্ধতা ও সমাজবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়।

যেমন- বেবুন (এক জাতির বানর) দল বেঁধে থাকে। এদের প্রতিটি দলে থাকে একজন দলপতি । দলের কোন সদস্য আক্রান্ত হলে সামর্থবান পুরুষ সদস্যরা তার প্রতিরক্ষায় ঝাঁপিয়ে পরে। তখন দলের শিশু ও মেয়ে বেবুনদেরকে রাখা হয় নিরাপদ বলয়ে। এরা যখন খাবারের সন্ধানে কোন ফসলের ক্ষেতে ঢুকে যায় তখন কোন গাছের উঁচুতে চড়ে যায় কোন একটি বেবুন। পাহারায় থাকে কোন দিক থেকে বিপদ এলে যাতে সর্তক করে দিতে পারে সঙ্গী-সাথী দেরকে।

শিম্পাঞ্জীর ভিতর বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন এক অদ্ভুত ব্যাপার। অসুস্থ শিম্পাঞ্জীরা বয়োবৃদ্ধ ও অভিজ্ঞ শিম্পাঞ্জীদের

কাছে যায় চিকিৎসা সেবা লাভ করার জন্য। সাথে করে নিয়ে যায় নানা ফল-মূল যেমন- কলা ইত্যাদি চিকিৎসক শিম্পাঞ্জির পারিতোষিক হিসেবে। অদ্ভুৎ তাই না ? ভাবতে কেমন লাগে !

পিঁপড়া, উইপোকা বা মৌ-মাছিদের কথা আমরা সবাই জানি। মনুষ্য সমাজের মতই এরা সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করে। মানুষের মত এদের মধ্যেও পদমর্যাদার স্তরভেদ দেখা যায়। এদের সামাজিক জীবন খুবই চিত্তাকর্ষক। মৌমাছির যে কোন পূর্ণ বিকশিত কলোনিতে (চাকে) তিন শ্রেণীর মৌমাছি দেখা যায়। রাণী (১টি), রাজা (কয়েকটি-কয়েকশত) এবং কর্মী (কয়েক হাজার-কয়েক লক্ষ)। রাণী মৌমাছি হল কলোনির প্রধান। একটি কলোনির সকল সদস্য রাণীর অনুগত। রাণীর দেহ নিঃসৃত এক প্রকারের হরমোনের প্রভাবে কলোনির সকল সদস্য মিলে মিশে সুশৃঙ্খলভাবে বসবাস করে। রাজা কোন কাজ করে না। অপরদিকে কর্মী মৌমাছি হল কলোনির জন্য নিবেদিত প্রাণ। কর্মী মৌমাছির ৪-৬ সপ্তাহের জীবনে শৈশব বলে কিছু নেই। বয়স ৩-৪ দিন হলে এরা চাকের মধু কুঠুরী পরিষ্কারের কাজ শুরু করে। ১২ দিন বয়স থেকে মৌচাক নির্মাণের কাজ করে। ১৮-২০ দিন বয়সে ফুলের মধু আহরণ করে এবং পরাগ রেনু সংগ্রহ করে। এছাড়া কলোনির তরুণ সদস্যরা খাবার অনুসন্ধান, চাকের রক্ষণা-বেক্ষণ, লার্ভার পরিচর্যা এবং বয়স্ক মৌমাছিদের সেবা সহ আরো বিভিন্ন কাজ করে থাকে। বৃদ্ধ বয়সে মৌমাছিরা সাধারণত: বেশী দুরে যায় না। এরা শুধু পানি পরিবহণ করে এবং অবসর যাপন করে। ভাবুন, কি অদ্ভুত এদের সামাজিক জীবন!

বেশ কিছু প্রাণীর মধ্যে আবার লক্ষ্য করা যায় সন্তান বাৎসল্য। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় এক প্রজাতির ব্যাঙ এর কথা। যারা- ডিম পেরে তা থেকে বাচ্চা জন্মান পর্যন্ত এদেরকে নিজের শরীরের সাথে আটকে রেখে রক্ষা করে। মা ক্যাঙ্গারু তার বাচ্চাদেরকে নিজ শরীরের থলিতে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

কাক বা বাবুই এর মত আরো অনেক পাখি ডিম পাড়ার আগে নীড় রচনা করে। ডিম প্রসবের পর তা স্বযত্নে তা দেয়- রক্ষা করে শত্রুর আক্রমন থেকে। বাচ্চা হবার পর তাদেরকে আগলে রাখে বাজ বা চিলের মত শিকারী পাখিদের শ্যেন দৃষ্টি থেকে।

স্বজাতির মৃত্যুতে কাকেরা কি করে তা আমরা সবাই দেখেছি। বন্য প্রাণীদের মধ্যেও এমনটা দেখা যায়। আফ্রিকার জংগলে দলবদ্ধভাবে চারনরত প্রাণীরা সিংহ বা অন্য কোন হিংস্র পশু দ্বারা আক্রান্ত হলে কখনো কখনো তারা পাল্টা আক্রমন করে এবং আক্রান্ত ও আহত সদস্যকে উদ্ধারে সক্ষম হয়।

নিম্ন শ্রেনীর প্রাণী - কীট-পতঙ্গের আবেগ-অনুভূতি ও বুদ্ধিমত্তার কাহিনী বলে শেষ করা যাবে না। মানুষ সবচে বুদ্ধিমান ও সৃষ্টির সেরা সন্দেহ নেই। তারপরও নিম্নশ্রেনীর প্রাণীদের মধ্যে যখন মানুষের আবেগ - অনুভূতি প্রসূত আচার আচরনের অনেকটার সাথে মিল খুঁজে পাওয়া যায় তখন তা বেশ বিস্ময় ও চমকের সৃষ্টি করে বৈকি!

অলঙ্কার

বীর বাহাদুর (মিজান)
কিউ.সি, পিন নং-১৩৯৫৩, ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিঃ

বাবা যথেষ্ট রকমের সবুর করিলেও দিন যতই গড়াইতেছে মা ততই স্থির হইতে অস্থির হইয়া উঠিতেছেন। ইহার কারণ একমাত্র আমিই বটে। ইসলাম ধর্ম ও উহার শাস্ত্রমতে জন্মের পর হইতেই মানুষের বয়স কমিতে থাকে। পশ্চিমাদেরও বয়স লইয়া ভাবনা করিবার তেমন কোন আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় না। অফিস আদালত ইত্যাদি ক্ষেত্র বিশেষের কথা নিতান্তই ভিন্ন। সেখানে কাহার কত বয়স, কাহার কন্যার বিবাহের বয়স পার হইয়া যাইতেছে, অমুক বাড়ির অমুকের মেয়ের বয়স একুশ হইতে একত্রিশে পড়িল; এই রকমের কোন কানা-ঘুষা শোনা যায় না। কেবল মাত্র আমাদের এই বঙ্গদেশ তথা গোটা ভারতবর্ষে এইসমস্ত লইয়া নরনারী উভয়েই মাথা কুটিয়া মরে। আমার শিশুবেলার বয়সটাই ছিল প্রচন্ড রকমের প্রশান্তির। সেই বয়সে মায়ের মমতা, বাবার স্নেহ, স্বজনদের আদর, প্রতিবেশীদের শুভদৃষ্টি এই সমস্ত লইয়া তখনকার সময়টা ছিল একান্তই মধুর। কেহ যদি বাবাকে রহস্য করিয়াও বলিত, "ট্যাক্সি ড্রাইভার যদি তাহার মেয়ের পেছনেই সমস্ত ঢালে, তবে সে কি করিয়া উন্নতির মুখ দেখিবে? আজকে লাল জামা, কালকে ক্যাপ টুপি, পরশু ছুট প্যান্ট, আরও কতকি! ঐসব বাপু আমাদের দ্বারা হইবে না। আমাদেরতো আবার সমাজের পাঁচ দশ জনের সহিত মিলিতে হয়। সমাজ জামাত বলিয়া একটি কথা আছে কিনা তাই!" বাবা ছিলেন দুই-চার ক্লাশ পড়ুয়া। এমন সমাজ পুত্র যুধিষ্ঠীরের দলকে বাবা মানিতেন না। কেবল মানিয়া চলেন, এই রূপ ভান করিতেন। ইহাদের মনে ঈর্ষা হইবে নাই বা কেন? নিজ কন্যার স্বাদ আহ্লাদ পূরণে বাবার জুড়ি ছিল না। মহল্লার লোকেদের কটুকথায় বাবা কখনও মনে কষ্ট পাইলে আমার জননী তাহা অনুভব করিতে পারিতেন। তিনিই বাবাকে সাহসের যোগান দিতেন। আদর যত্ন করিয়া তাহার সমস্ত কষ্ট ও দুঃখ-বেদনাকে মোচন করিয়া দিতেন। পুঁথিগত বিদ্যায় জননী খানিকটা খাটো হইতে পারেন কিন্তু কেমন করিয়া আপন স্বামীর মন রক্ষা করিতে হয়, কি করিয়া স্বামীর সুখ-দুঃখের সঙ্গী হওয়া যায়, কি করিয়া তাহাকে পুলোকিত রাখা যায় সেই সকল তিনি ভালোই জানিতেন। স্বামীর মনোরঞ্জনের সমস্ত কৌশলই বিধাতা তাহাকে দান করিয়াছিলেন।

এই বঙ্গদেশে যাহাদের ঘরে একটি মাত্র কন্যা সন্তানও বিধাতা দান করিয়াছেন, তাহাদের যেন আরামের ঘুম হারাম হইয়া গিয়াছে। তাহাদের স্বাভাবিক মানষিকতার যেন বিকৃতি ঘটিতে থাকে। যাহারা নিজেদের কথা চিন্তা করেন না, তাহাদের কথা ভিন্ন। সন্তানের কথা তাহারা না ভাবিলেও পারেন। কিন্তু আমার পিতা মাতা অন্য দলের মানুষ। কন্যা সন্তান ঘরে। তাহার বাড়তি পোষাকাদি, বাড়তি যত্ন, লেখা পড়ার খরচা ইত্যাদি চিন্তা করিতে হয়। কন্যা বড় হইতেছে, পিতা-মাতার ভাবনাও বাড়িতেছে। সন্তানের সুখের জন্য ভাল ঘরে সম্বন্ধ দরকার। যাহাতে সন্তান দাম্পত্য জীবনে সুখী হয়। বাবা আমাকে পেট পুরাইয়া খাওয়াইতে পারিতেন; তৈল, সাবান, পোষাকাদিও দিতে পারিতেন। বিদ্যার্জনের জন্য স্কুলেও ভর্তি করিয়া খরচ চালাইতেও সামর্থবান ছিলেন। হয়তোবা ইহার চেয়েও অনেক বড় রকমের প্রয়োজন তিনি মিটাইতে পারিতেন। কিন্তু কন্যা সন্তান বলিয়া কথা। নানা প্রকার অলঙ্কারে ইহাদের সুন্দর মানায়। ইহাদের সর্ববৃহৎ অলঙ্কার আপন স্বামী। কোন পিতা মাতা যদি তাহাদের কন্যাকে এই বৃহৎ অলঙ্কার যোগার করিয়া দিতে ব্যর্থ হন তবে ঐ পিতা-মাতার গোটা জীবনটাই ব্যর্থতার দাবানলে দগ্ধ হইতে থাকে। জননী আমার বিবাহের জন্য অতিশয় ব্যস্ত। আমার বিবাহের বয়স হইয়া যাইতেছে, ইহাতে পাড়ার লোকের চাইতে তাহার অস্থিরতাই বেশী। আমাকে বিবাহ দিয়া পরের ঘরে পাঠাইতে পারিলেই যেন তাহার শান্তি। অন্তত মহল্লার দুস্ট লোকেদের নানা কথা হইতে মুক্তিতো মিলিবে। বাবাও এই বিষয়ে ব্যস্ত কম নহেন। আমার বিবাহ অনুষ্ঠানে তিনি সমস্ত আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, আমার স্কুলের মাষ্টার, প্রতিবেশী সকলকে নিমন্ত্রণ করিবেন। যুত করিয়া বর পক্ষকে খাওয়াইবেন। ইহার জন্যই তাহার কর্মব্যস্ততা বাড়িয়াছে। বর-কনের ঘর সাজাইয়া দিবেন এমন পরিকল্পনাও তাহার আছে।

গণতান্ত্রিক দেশ। যুদ্ধ করিয়া বাঙ্গালী জাতি মুক্তি আনিয়াছে, কিন্তু সুখটি আনিতে পারে নাই। লাল সবুজের পতাকা অর্জন করিয়াছে বটে, কিন্তু সেই পতাকার সম্মান কতটুকু অর্জন করিয়াছে? আমার জন্মের মাধ্যমে আমার পিতা-মাতা সমাজের দেওয়া 'বন্ধ্যা' কলঙ্ক হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাই আমার নাম রাখিয়াছেন 'মুক্তি'। সমাজের বন্ধ্যা কলঙ্ক হইতে তাহাদের রেহাই মিলিয়াছিল বটে কিন্তু সার্বিক দিক দিয়া তাহারা এখন কর্তব্যের বন্ধনে আবদ্ধ। সত্যিকারের মুক্ত নয়। বঙ্গ জনগোষ্ঠির অবস্থাও ঠিক একই রকম।

গত সরকারের পরিবর্তন হইয়াছে, নতুন সরকার ক্ষমতা পাইয়াছেন। বছর দুয়েক বেশ চলিয়াছে। বর্তমানে বাজার মূল্য চাঁদে চাঁদে বাড়িতেছে। আমাদের মতো ছোট দেশগুলি স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, কিন্তু সার্বিক মুক্তি হইতে এখনও বঞ্চিত। এখনও বৃটিশ তথা পশ্চিমাদের চোখ টিপুনিতে ছোট ছোট দেশ গুলির রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়। বহু সাধারণ মানুষ অকালে প্রাণ হারায়। বিশ্ব বাজারও তাহারাই নিয়ন্ত্রণ করেন। বিশ্ব বাজারের সহিত তাল মিলাইতে আমাদের বর্তমান সরকারও কৃষকের সার, ঔষধ, তৈলের দাম বৃদ্ধি করিয়াছেন। বিরোধী দলগুলিও চুপ করিয়া নাই। একের পর এক মিছিল, মিটিং, হরতাল, অবরোধ চালাইতেছে। আন্দোলন প্রখর হইতে বৃহৎ আকার ধারণ করিতেছে। সরকার পক্ষও থামিয়া নাই। বিরোধী দলের আন্দোলন ঠেকাইতে সরকার নামাইয়াছে দাঙ্গাপুলিশ। পথে-পথে, মোড়ে-মোড়ে এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থানে তাহাদের অবস্থান। আন্দোলনকারীদের লাঠিপেটা করা হইতেছে। নাম করা নেতা নেত্রীদের রাস্তায় অপদস্তও করা হইতেছে। নেতা নেত্রীগণ ভিড়ের মধ্যে নিজের পোষাকের বেহাল দশা করিয়া রাস্তায় লুটাইয়া পরার দৃশ্যও এদেশের মানুষ দেখিতেছে প্রচার মাধ্যমের কল্যাণে।

ঘরভাড়া, খাওয়া-পড়ার খরচ জোগাইতেই বাবা প্রায় অতিষ্ট। সারাক্ষন বাবাকে চিন্তিত দেখায়। একদিন গাড়ি চালাইতে না পারিলে পরের দিন ঘরে খাবারের অভাব দেখা দেয়। মায়ের মুখে শোনা যায়, "তেল নাই, সাবান নাই", ইত্যাদি ইত্যাদি। একবার টানা তিনদিন হরতাল পড়িল – "গাড়ির চাকা ঘুরবে না, অফিস-আদালত খুলবে না"। যাহারা দিন আনে দিন খায় তাহাদের হরতাল মানিলে চলিবে কেন? তখন আমি ভালোই বুঝিতে শিখিয়াছি। হরতাল একদিন পার হইল। বাবা দ্বিতীয়দিন বাহির হইলেন। চায়ের দোকানে চা পান করিতেছেন। বাবার চিন্তা দূরে কোথাও যাইবেন না। নিকটের কিছু ভাড়া পাইলেই হয়। হঠাৎ একটি বালক আসিয়া অনুরোধ করিয়া কহিল, "আমার মা প্রচন্ড অসুস্থ, এ্যাম্বুলেন্সের আশায় বসে থাকলে তাকে বাঁচানো ভার; আমার মাকে হাসপাতালে পৌঁছে দিন।" বাবা রোগীকে পৌঁছাইয়া দিলেন। ফেরার পথে অনেকেই বলিতেছিলেন, রাজনৈতিক বাতাস সুবিধার মনে হইতেছে না। বাবা মানিলেন না। খানিকটা পথ ফিরিবার পরই রাস্তার দুইপাশে বেশ লোকজনের ভীড়। গাড়ী থামানোর চেষ্টা। ইতিমধ্যে দুই-চারিটি ইট পাটকেল গাড়িতে আসিয়া পড়িয়াছে। লাঠি হাতে লোকজন গাড়ির দিকে আগাইতেছে। বাবা দ্রুত বিপদময় এলাকা পাড়ি দিতে চেষ্টা করিলেন। একটি পেট্রোল বোমা গাড়ির উপর আসিয়া পড়িল। আরও একটি বোমা। গাড়ি দাউদাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। বাবা নিজেকে বাঁচাইবার জন্য গাড়ি থামাইয়া নামিয়াছিলেন। তাহার সমস্ত শরীরে আগুন জ্বলিতেছে। এক পানের দোকানদার পানি ঢালিয়া আগুন নিভাইয়াছিলেন। কিন্তু দাহনের যন্ত্রণা কেহ থামাইতে পারে নাই। কাছের কোন একটি ক্লিনিকে লইবার কথা অনেকেই কহিলেন, কিন্তু তাহার আগেই বাবার প্রাণ পাখিটা দগ্ধ দেহ হইতে বাহির হইয়া গেল। কোন এক প্রতিবেশী কাকা অন্যান্য প্রতিবেশীদের সহযোগিতায় কাফন দাফনের ব্যবস্থা করিলেন। মায়ের কান্না কেহ থামাইতে পারিল না। মা কেবলই আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া বারংবার কহিলেন, "এ আমার কি হল মুক্তি? কেন এমন হল?" আমি নিঃস্ব, নিস্প্রাণ পাখির বাচ্চার মতন নিরবে দুই চোখের জল ঢালিয়া ছিলাম।

দারিদ্রতার নির্মম ঘাত প্রতিঘাতে বিদ্যার্জনের চাকা স্থির হইল, অস্থির হইয়া উঠিল পেটের ক্ষুধা। জীবনের চাকা যেদিকে চলে চলুক। পণ করিলাম যৌতুক দিয়া কাহারো ঘরের ঘরণী হইবার তিলার্ধ চেষ্টা করিব না। আগে পেটের ক্ষুধা থামাইতে হয়। পরে মনের ক্ষুধা লইয়া চিন্তা। প্রতিবেশীরা যাহা খুশি বলুক। বঙ্গদেশ তথা গোটা ভারত বর্ষের

লোকের কন্যা ভগ্নিদের বয়সের মাত্রা, বিবাহ সাদী ইত্যাদি লইয়া মাথা কুটিয়া মরে মরুক। আমি আমার মত করিয়া নিজেকে অগ্রসর করাইব।

মা সেলাই মেশিনের কাজ জানিতেন। শুনিয়াছিলাম ঢাকা শহরে গার্মেন্টস জগৎ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। এই শিল্প বাংলাদেশের বৈদেশীক মুদ্রা অর্জনের অন্যতম উৎস। ইহা এই দেশের মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করিয়াছে। বেকারত্ব কমাইতে সহায়ক ভুমিকা পালন করিতেছে। আমার কোন মামা খালুর জোর নাই। তাহার উপর আবার কন্যা সন্তান হইয়া ধরনীর বুকে জন্মাইয়াছি। পুত্র হইলেও একটা কথা ছিল। আনারী গোছের একটি মেয়ে বিবাহ করিয়া একটি সরকারী চাকুরী লইতেও হয়তো সফল হইতাম।

খোঁজ করিয়া ব্যাবিলন নামের একটি গার্মেন্টেসে চাকুরী লইলাম। ইহার নামখানা বেশ সুন্দর। ইহার পরিবেশ স্থপতি, চালিকাশক্তি এবং পরিচালনা পদ্ধতি ইত্যাদি মিলিয়া গার্মেন্টসটি বর্তমানে বেশ স্বনামধন্য। ইহা ছাড়াও নানা দেশের ক্রেতাগণের নিকট হইতে অর্জন করিয়াছে অভূতপূর্ব সাফল্য। আমার পিতার মৃত্যুর পর হইতে বেশ কয়েক বৎসর যাবৎ আমি এইখানে চাকুরী করিতেছি। মাকে সঙ্গী করিয়া সংসার পাতিয়াছি। প্রতিদিনের কার্য শেষে ঘরে ফিরিয়া দেখি জননী আমার পথ চাহিয়া বসিয়া আছেন, নয়তো উঠানে পায়চারী করিতেছেন। অবিবাহিত কন্যা সন্তানদের বিবাহের চিন্তায় এদেশের অভিভাবকদের জীবনী শক্তি প্রায় কঙ্কালসার হইয়া যায়। সত্যি বলিতে এই যে, বিধাতা সব ভালো কাছাকাছি সৃষ্টি করেন নাই। যদিও করিয়া থাকেন তবে তাহা একে অপরকে বুঝিবার ক্ষমতা দান করিয়াছেন একেবারেই সীমিত। মা এখনও আমার ভবিষ্যৎ বিবাহ সাদী লইয়া সারাক্ষণ ভাবনা করিয়া ফেরেন। কবে আমি বৃহত্তম অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইব জানি না। কবে জননীর এরূপ দুঃচিন্তার সমাপ্তি ঘটিবে আল্লাহ জানেন।

সে যাহা হউক, আমি বর্তমানে ব্যাবিলনকে লইয়া ভাবনায় পড়িয়াছি। ব্যাবিলন কথকতা-কে লইয়া ভাবনা করিতে আরও মধুর লাগে। ব্যাবিলন কথকতা-এর জ্ঞানী গুণী লেখকদের সঙ্গী হইবার যোগ্যতা আমার মাঝে খুঁজিয়া পাইলাম কই? আমার কোন লেখা সে কি কোন কালেও তাহার অন্তরে ধারণ করিবে? -ইত্যাদি স্বপ্ন গুচ্ছ আমার অন্তরে বাঁশের বাঁশির মতো বাজে। প্রভাত-সকাল, দুপুর-বিকাল, সন্ধ্যা-রজনী সারাক্ষণ শুধু "ব্যাবিলন কথকতা", "ব্যাবিলন কথকতা।" আমার এই সামান্য লিখন যদি ব্যাবিলন কথকতা-এর অন্তরে ক্ষীণকায় সাহিত্যরূপে স্থান করিতে সক্ষম হয়, তবে বুঝিব আমার মানব জীবন ধন্য। হে ব্যাবিলন কথকতা- তুমি তোমার চলার পথ এবং আপন গতিশীলতাকে পদ্মা, যমুনার মত আজীবন রাখিও বহমান। কোন কালেও যেন তুমি পূর্ণিমা হইয়া পরে অমাবশ্যার অন্ধকারে হারাইওনা, সূর্যদেবের মত নিজেকে আলোকিত ও চলমান রাখিও।

পরিশেষেঃ-

আমার মত কাঙ্গাল লেখকের মৃত্যু হয় হোক
তবু তোমার মঙ্গলার্থ সকলে বুঝুক।

আমার লেখনি তুমি নাইবা করিলে ধারন
কভু যেন তোমার না হয় মরণ।

মায়ের কষ্ট, বাবার মৃত্যু সবই যেন যাই ভুলে
তোমার জীবন ভরিয়া উঠুক রঙ্গিন পদ্ম ফুলে।

দুর্বল চিন্তা দুর করিয়া, ভুলিয়াছি যত ব্যথা
সবল চিত্তে বাঁচিয়া থাকুক "ব্যাবিলন কথকতা"।

ক্যান্সার প্রতিরোধে দই

ডাঃ বিকাশ সরকার
মেডিক্যাল অফিসার, ব্যাবিলন ক্যাজুয়ালওয়্যার লিঃ

দই আমাদের বাংলা ঐতিহ্যের অংশ। বাংলা সংস্কৃতিতে প্রতিটা অনুষ্ঠানের শেষে দই খাওয়ানোর রীতি প্রচলিত আছে। দই ক্যালসিয়ামের একটি বড় উৎস এ ছাড়া এতে রয়েছে প্রোটিন, খনিজ ও ভিটামিন। যেমন - রিবোফ্লাভিন, বি-১২, ফসফরাস ও পটাশিয়াম।

দইয়ে রয়েছে কিছু জীবন্ত জীবানু (ল্যাকটোব্যাসিলাস, বুল গেরিকাস ও স্ট্রেপটোকক্কাস থার্মোফিলাস) যা দেহে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং কমায় রক্তের কোলস্টেরল, কিছু ধরনের ক্যান্সার, বিশেষ করে পাচক নলের ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়।

উচ্চ রক্তচাপের উপর প্রভাব ঃ
পরিবারের সবাই যদি কম ফ্যাটযুক্ত দই খায় তাহলে তারা পাবে ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম ও ম্যাগনেশিয়াম। এই তিনটি খনিজ উচ্চ রক্তচাপ কমাবে।

কোলোন ক্যান্সার থেকে সুরক্ষা ঃ
কোলোন বা পেটের বৃহদন্ত্রের অংশের ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায় ক্যালসিয়াম। প্রচুর দই খেলে কোলোনের ক্যান্সারের ঝুঁকি কমে যায়।

হাড় ক্ষয়রোধে দইয়ের ভুমিকা ঃ
আমাদের দেশে এমন কোন নারী/মেয়ে নেই যার জীবনে কোমর বা হাঁটুতে ব্যথা হয়নি। গবেষকরা বলেন হাড় ক্ষয়ের কারনে এমন ব্যথা হয় যা ক্যালসিয়াম ছাড়া সুস্থ করা সম্ভব নয়। ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ দই হাড়ের সুরক্ষা করে, অধিক পরিশ্রমী শ্রমিকদের তাই দই খাওয়া উচিত।

যাদের পেটে দুধ হজম হয় না ঃ
সি.এম.কজ বলেছেন দইয়ে বিটা ম্যালাক্টোসাইজেজ নামে যে এনজাইম রয়েছে তার প্রভাবে যে সব রোগীর পেটে দুধ সহ্য হয় না তাদের দই শর্করা ল্যাকটোজ হজম হতে পারে।

শিশুদের ডায়রিয়া অনেক কম হয় দই খেলে।

মেয়েদের সাদা শ্রাব নিয়ন্ত্রনে ঃ
ই.হিলটন নামে চিকিৎসা বিজ্ঞানী বলেছেন যে সব দইয়ে ল্যাকটোব্যাসিলাস এসিডোকিলাস জীবানু আছে সেই দই খেলে ৩ গুন সংক্রমন কমে। এতে করে মেয়েদের সাদা শ্রাবের উপকার হয়।

দইয়ের অনেক গুন। শুধুমাত্র জীবন্ত জীবানুর জন্য রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা খুব বেশী করে। তাই আমাদের নিয়মিত দই খাওয়া উচিত।

গার্মেন্টস শিল্পের বিকাশ – বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

মোহাম্মদ হাসান
এ.জি.এম, প্রধান কার্যালয়, ব্যাবিলন গ্রুপ

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের অর্থনীতির ভিত্তি ছিল কৃষিখাত। দেশের জনসংখ্যার শতকরা ৮৫ ভাগের নিবাস গ্রামে। তখন দেশের সরকারের মূল লক্ষ্য ছিল কি করে কৃষিখাতে সর্বোচ্চ উৎপাদনশীলতা অর্জন করে খাদ্যে স্বনির্ভর হওয়া যায় ও দারিদ্রতা দূর করা যায়। কৃষিভিত্তিক রপ্তানীর অন্যতম ছিল – পাট, চা ও তামাক। বিশ্ববাজারে ক্রমাগত পাটের মূল্য পড়ে যাওয়ায় সোনালী আঁশ দ্রুত তার ঔজ্জ্বল্য হারায়। পাট রপ্তানী হুমকির মুখে পড়ে।

কৃষিজাত পণ্য রপ্তানী যখন সংকটের মুখে তখন তৈরী পোষাকের আভ্যন্তরীন চাহিদা মিটাবার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত পোষাক শিল্প কারখানার দু' একটি ইউরোপে স্বল্প মাত্রার কিছু রপ্তানীর নজির সৃষ্টি করে। তখনো কেউ ভাবেনি কি বিপ্লব ঘটতে যাচ্ছে এই খাতে। রিয়াজ গার্মেন্টস, প্যারিস গার্মেন্টস, জুয়েল গার্মেন্টস ও বৈশাখী গার্মেন্টস্ সেই সময়কার উল্লেখ করার মত কয়েকটি পোষাক নির্মাতা। ১৯৭৮ সালে পোষাক শিল্পখাতে মোট রপ্তানী দশ লক্ষ ডলারের চেয়েও কম ছিল। ১৯৬০ সনে জন্ম নিয়ে ১৯৭৩ সনে 'রিয়াজ ষ্টোর' থেকে 'রিয়াজ গার্মেন্টস লিমিটেড' নামে আত্ম প্রকাশ করা প্রতিষ্ঠানটি, ১৯৭৮ সালে প্রথম বারের মত বাংলাদেশ থেকে ফ্রান্সে দশ হাজার পিস্ পুরুষদের শার্ট রপ্তানী করার গৌরব অর্জন করে।

১৯৭৯ সনে প্রতিষ্ঠিত হয় দেশের সর্বপ্রথম কেবলমাত্র রপ্তানীর লক্ষ্যে নির্মিত তৈরী পোষাক শিল্প কারখানা 'দেশ গার্মেন্টস লিমিটেড'। দক্ষিন কোরিয়ার বিখ্যাত দে উ কর্পোরেশন (Daewoo Corporation) এর সাথে কারিগরী ও বিপনন সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত দেশ গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠার বছর ১৫ জন মেয়ে সদস্য সহ মোট ১২৬ জনের এক কর্মী ও কর্মকর্তা বাহিনীকে পাঠায় দক্ষিন কোরিয়ায় পুসান (Pusan) শহরে দে উ কোম্পানীর একটি পোষাক নির্মাণ কারখানায়।

১৯৮০ সনে দেশ গার্মেন্টস চট্টগ্রামের কালুর ঘাট শিল্পাঞ্চলে পোষাক উৎপাদন শুরু করে বিশ্ববাজারে রপ্তানীর লক্ষ্যে। দেশ গার্মেন্টস্ এর অব্যবহিত পর আরো দুটি রপ্তানীমুখী পোষাক তৈরী কারখানা জন্ম নেয়। এরা হল 'আজিম-মান্নান গার্মেন্টস লিঃ' ও 'ইয়াং ওয়ানস্ বাংলাদেশ'। শেষোক্তটিও একটি কোরিয়ান প্রতিষ্ঠান যারা বাংলাদেশের TREXIM LTD. নামে একটি কোম্পানীর সাথে যৌথভাবে কারখানা প্রতিষ্ঠা করে। এরপর কেডিএস গার্মেন্টস্ সহ আরো অনেক রপ্তানীমুখী পোষাক শিল্প কারখানা চট্টগ্রাম ও ঢাকা শহরে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে।

খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলাদেশী উদ্যোক্তাগন আন্তর্জাতিক তৈরী পোষাক বাজারে পরিচিতি লাভ করে। বিদেশী ক্রেতাগনও বাংলাদেশকে তৈরী পোষাকের সস্তা উৎস হিসেবে গ্রহন করতে থাকে। এ রকম সস্তা উৎসের সুবিধা গ্রহন করবার কারনেই ক্রেতাগন ক্রমাগত বাংলাদেশের বাজারের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকে। নানারকম সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা যেমন – কাঁচামাল আমদানীর জন্য Back to Back L/C সুবিধা প্রদান, বিনাশুল্কে কাঁচামাল ও ক্যাপিটাল মেশিনারী আমদানী সুবিধা এই শিল্পকে দারুন সহায়তা প্রদান করে এর দ্রুত বিকাশে।

১৯৮০ সাল অবধি পাট এবং পাটজাত দ্রব্যাদি বাংলাদেশের রপ্তানী পণ্যের তালিকায় শীর্ষে অবস্থান করে যার অবদান

ছিল মোট রপ্তানী আয়ের ৫০ শতাংশ। কিন্তু ১৯৮০ দশকের শেষ দিকে তৈরী পোষাক শিল্প খাত, পাট এবং পাটজাত দ্রব্যাদিকে পিছনে ফেলে তালিকার শীর্ষে অবস্থান করে নেয়।

১৯৮২ সালের শেষ অবধি ৪৭টি কারখানা জন্ম লাভ করে। বৈপ্লবিক পরিবর্তনটি ঘটে ১৯৮৪-৮৫ সনে, তখন কারখানার সংখ্যা দাড়ায় ৫৮৭টিতে। যা ১৯৮৯তে বেড়ে প্রায় ২৯০০ টি হয়।

বাংলাদেশের তৈরী পোশাক শিল্পের বিকাশে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ছিল - GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) অনুমোদিত Multifibre Arrangement (MFA) এর যা পোষাক উৎপাদনের আন্তর্জাতিক পুনর্বিন্যাসে (Relocation) সহায়তা করে। MFA এর আওতায় বিশ্বের বড় বড় ক্রেতা আমেরিকা এবং কানাডায় কোটা সীমাবদ্ধতা (Restriction) আরোপ করে, যা হংকং, দক্ষিন কোরিয়া, সিংগাপুর, তাইওয়ান, থাইল্যান্ড, মালয়শিয়া, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলংকা এবং ইন্ডিয়ার রপ্তানীকে সীমিত করে দেয়। অন্যদিকে বাংলাদেশের জন্য এই MFA আশীর্বাদ (১৯৮৫ সাল থেকে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে আমেরিকা ও কানাডার বাজারে কোটাভুক্ত হয়) হিসেবে দেখা দেয়। স্বল্পোন্নত দেশ (Least Developed Country) হিসেবে বাংলাদেশ আমেরিকা এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন ভুক্ত দেশ সমূহ থেকে অগ্রাধিকার ভিত্তিক সুবিধা পেতে থাকে। European Union কর্তৃক GSP (Generalized System of Preference) সুবিধা বাংলাদেশের রপ্তানী বাজারের নিশ্চয়তা প্রদান করে এবং আভ্যন্তরীন সুবিধা সমূহ একীভুত হয়ে বাংলাদেশ অনেকটাই অপ্রতিদ্বন্দ্বী সরবরাহকারীর ভুমিকায় রূপ নেয়। শুল্কমুক্ত আমদানী নীতি (রপ্তানীর ক্ষেত্রে), নগদ সহায়তা প্রদান (Cash Incentive) BTB L/C, বন্ডেড ওয়্যারহাউস সুবিধা (Tax Holiday), স্বল্প সুদের হার (PC- Packing Credit, EDF - Export Development Fund), রপ্তানী প্রসেসিং জোন (EPZ) এবং আমদানী রপ্তানীর আনুসঙ্গ সহজীকরন-এ সবকিছুই পোষাক শিল্পের বিকাশ কে তরান্বিত করে। ১৯৮৫ সনের মধ্যে বাংলাদেশ একটি শক্তিশালী পোষাক সরবরাহকারী দেশ হিসেবে প্রতিযোগী দেশ সমুহের মাঝে অবস্থান করে নেয়। শক্তিশালী প্রতিপক্ষ শ্রীলংকার আভ্যন্তরীন দ্বন্দ্ব এবং দক্ষিন পুর্ব এশিয়ার দেশ সমুহের দ্রুত শ্রম মুল্যের বৃদ্ধি বাংলাদেশকে আরেক দফা সুবিধা এনে দেয়। বিদেশী ক্রেতা বিকল্প খুঁজতে গিয়ে বাংলাদেশকে সস্তা শ্রম এবং বিপুল রপ্তানী কোটার সুবিধার জন্য একটি আদর্শ সরবরাহকারী দেশ হিসেবে চিহ্নিত করে।

শ্রমঘণ প্রতিষ্ঠানের সাথে শ্রম মজুরী সম্পর্কটা একান্ত নিবিড়। শ্রমঘন শিল্প হিসাবে পোষাক শিল্প বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশ যেখানে শ্রমমূল্য সর্বনিম্ন পর্যায়ে সেখানে পুনর্স্থাপন হওয়াটা বানিজ্যিক আন্তর্জাতিকীকরনের সহজ স্বাভাবিক ঘটনা।

স্বাধীনতার পরে যখন বাংলাদেশের প্রচলিত পণ্যগুলো যথাযথ প্রত্যাশা পুরণে ব্যর্থ হলো তখনই একদল উদ্যমী তরুন উদ্যোক্তা RMG (Readymade Garments) কে অপ্রচলিত পন্য (Non Traditional) হিসেবে রপ্তানীর তালিকায় নিয়ে আসতে সক্ষম হন। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অবস্থাও তখন এই RMG খাতকে প্রসারে সহায়তা করেছিল। এই উদ্যমী উদ্যোক্তাগণ বুঝেছিলেন নিজেদের পক্ষে কথা বলার জন্য তাদের সাংগঠনিক একটি ভিত্তি দরকার যা থাকবে প্রচলিত আমলাতন্ত্রের বেড়াজাল থেকে সম্পুর্ন মুক্ত।

তারা বুঝতে পেরেছিলেন এই সেক্টরের সফলতা নির্ভর করে সময়ের কাজ সময়ে সম্পাদন করতে পারার মধ্যে দিয়ে। সেই লক্ষ্যে ১৯জন উৎপাদক এবং রপ্তানীকারক মিলে ১৯৮৩ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী গড়ে তুলেন BGMEA (Bangladesh Garments Manufacturers and Exporters Association)। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা

প্রায় ৪০০০ (চার হাজার)। অন্যদিকে বিশেষ ভাবে নীটওয়্যার খাতে সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে দেশের অগ্রগতিকে আরো একধাপ এগিয়ে নেওয়ার বাসনা থেকে ১৯৯৬ সনে কিছু সংখ্যক নীট শিল্প উদ্যোক্তা গড়ে তোলেন BKMEA (Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association)। যার প্রধান কার্যালয় বাংলাদেশের ডান্ডি বলে খ্যাত নারায়নগঞ্জে প্রতিষ্ঠিত। যার বর্তমান সদস্য সংখ্যা প্রায় ১৫০০ (এক হাজার পাঁচ শত)। শুরুতে শুধুমাত্র কয়েকটা নির্ধারিত ধরনের পোষাক রপ্তানী করলেও বর্তমানে তার আওতা বেড়ে প্রায় সব ধরনের পোষাকই বাংলাদেশের প্রস্তুতকারকেরা রপ্তানী করছেন।

পরবর্তীতে দেশে সহযোগী শিল্প হিসাবে কার্টুন, পলিব্যাগ, Label, Button, সেলাই সুতা, Adhesive tape ইত্যাদি শিল্প গড়ে উঠে। অন্যদিকে এই সেক্টর ব্যাংক, বীমা, শিপিং, হোটেল, ছাপাখানা, পর্যটন, পরিবহন, ইত্যাদি খাতের প্রসার ঘটিয়েছে ব্যাপকভাবে। সবচেয়ে সরাসরি Mother Raw Materials হিসাবে Textile শিল্পকে Spinning, Weaving, Dyeing, Finishing শিল্পে সাহায্য করে আসছে। শুরুতে পোষাক শিল্প প্রায় সম্পূর্নভাবে বিদেশী Accessories এর উপর নির্ভরশীল থাকলেও বর্তমানে প্রায় ৭০% প্রয়োজন মিটছে আভ্যন্তরীণ উৎস থেকে। দেশের পোষাক শিল্প ১৯৮১ সালে রপ্তানী করেছিল আমেরিকান মুদ্রায় মোট ৬.৪ মিলিয়ন, ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে তা গিয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১০.০০ বিলিয়নে। বর্তমানে উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশসহ প্রায় ৩০টি দেশে বাংলাদেশের নির্মিত পোষাক রপ্তানী হয়।

Compliance ইস্যুতে বাংলাদেশের গার্মেন্টস্ সেক্টরের ইতিবাচক পদক্ষেপ এই বিকাশকে আরো সুদৃঢ় করে। পোষাক শিল্পে শিশু শ্রম বন্ধের লক্ষ্যে যৌথভাবে BGMEA, ILO, UNICEF এবং US এম্বেসী একটি MOU স্বাক্ষর করে ১৯৯৪ সালের ৪ঠা জুলাই। যেখানে বাংলাদেশ ১৯৯৬ সনের নভেম্বরের মধ্যে শিশু শ্রম বন্ধের অঙ্গিকার করে। এই লক্ষ্যে BGMEA, BKMEA আন্তরিকতার সাথে উদ্যোগ গ্রহন করে এবং সফল হয়। BGMEA, BKMEA এবং কিছু NGO শিশু শ্রমিকদের অর্থনৈতিকভাবে সহায়তা করে এবং তাদের লেখাপড়া করার সুযোগ করে দেয়। শিশু শ্রম ছাড়াও নুনতম মজুরী, কর্ম ঘন্টা, নিয়মিত এবং নির্ধারিত সময়ে বেতন, সুন্দর কর্ম পরিবেশ-এ বিষয় গুলো এখন প্রায় সব কারখানাতে প্রতিষ্ঠাপিত। বর্তমানে বাংলাদেশের গার্মেন্টস্ শিল্প একটি শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে বলে সংশ্লিষ্ট সকলের আশাবাদ।

আনলাকী থার্টিন যদি লাকী হয় !

মুহাম্মদ সাইফুল হক

ম্যানেজার, মার্চেন্ডাইজিং এন্ড মার্কেটিং, ওভেন টপস্

স্বপ্নটা দেখতে শুরু করেছিল আনিস, আমার সাবেক সহকর্মী মার্চেন্ডাইজার আনিসুর রহমান। যেদিন ওর বিলাতি ক্রেতা ওকে তাদের অফিসে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানাল সেদিন থেকেই এই স্বপ্নের শুরু। আনিস সেভাবে প্রস্তুতিও নিয়েছিল কিন্তু ওর স্বপ্ন ভঙ্গ হল অরিজিনাল আমন্ত্রণ পত্রটি সময়মত না পাওয়ার জন্য। বিকল্প হিসেবে আমার চেষ্টা– ব্যাবিলনের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে। আমি অবশ্য ধরেই নিয়েছিলাম বৃটিশ ভিসা রিফিউজাল ঠেকানো আমার সাধ্য নয়– কিন্তু চেষ্টা করতে দোষ কি ?

শুরু হল চেষ্টা যজ্ঞ– আনিসের ভিসা রিফিউজাল যে যে কারণে জানানো হয়েছে তার কোনটি যাতে আমার ক্ষেত্রে না হয় তা নিশ্চিত করতে চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। উপরন্তু V.F.S. অফিসে গিয়ে জেনে আসলাম ভিসা নিশ্চিত করতে কি কি পেপারস্ জমা দিতে হবে। সেই সাথে পরামর্শ নিলাম আমার এক সিনিয়র ফ্রেন্ড এর যিনি লন্ডনে থাকেন এবং দু-সপ্তাহের ছুটিতে ঢাকা এসেছেন। সবার পরামর্শ নিয়ে সংগ্রহ করতে হল ২২ রকমের পেপারস্ ও ডকস্। এই কর্ম যজ্ঞে আমার বস ও সহকর্মীদের সহযোগিতার কথা আমি নিশ্চয়ই ভুলিনি। এসব কিছু করতে করতে মিটিং এর সময় ঘনিয়ে এল কিন্তু আমার অরিজিনাল আমন্ত্রণ পত্রটি তখনও এসে পৌছায়নি। শেষে যে দিন পত্রটি আসার কথা সেদিনই আবেদন পত্র জমা না দিলে ভিসা পেলেও সময় মত আমি মিটিং এ যোগ দিতে পারব না। টেনশন শুরু হল। আমার অফিস এসিস্ট্যান্ট একটি ছেলেকে পাঠালাম এয়ারপোর্টে ক্লিয়ারিংস থেকে পত্রটি আনার জন্য আর আমি অপেক্ষা করতে থাকলাম V.F.S. অফিসে। পত্রটি যখন হাতে পেলাম তখন এক ঘন্টা বাকী ছিল V.F.S. এর কর্ম দিবস শেষ হতে। ২২শে এপ্রিল ২০০৮ এর শেষ বিকালে আবেদন পত্র জমা দিতে গিয়ে বুঝলাম বৃটিশ ভিসা পাওয়া এখনও সাধ্যের বাইরে। আবেদন পত্র গ্রহন কারিনী সমস্ত ডকস্ চেক করে বললেন আপনি তো কোম্পানীর অরিজিনাল পেপারস্ জমা দেননি যেমন – ট্রেড লাইসেন্স, ভ্যাট সার্টিফিকেট ইত্যাদি। আর তা ছাড়া আপনাকেতো দুই সেট করে পেপারস জমা দিতে হবে। মনটা খারাপ হয়ে গেলো। বললাম কোম্পানীর অরিজিনাল ডকস্ আমার পক্ষে এখানে জমা দেওয়া সম্ভব নয়। তবে এক সেট বাড়তি কাগজ পত্র ফটোকপি করে দেয়ার চেষ্টা করতে পারি আপনি যদি কিছুটা সময় এলাউ করেন। তিনি বললেন তা সম্ভব নয়। আমি বললাম তাহলে যা দিয়েছি তাই জমা নিয়ে নিন। তার এক সহকর্মীর সাথে কথা বলে তিনি আবেদন পত্র জমা নিলেন। তারপর রেজাল্ট জানানোর দিন নির্ধারণ করলেন থার্টিনত মে। তারিখটি দেখার সাথেই বুকটা কেমন ছ্যাঁৎ করে উঠল। অনুরোধ করলাম আরেকটু আগে রেজাল্ট জানানো যায় কি না ? উদ্দেশ্য আনলাকী তারিখটি পরিবর্তন। কিন্তু তিনি নাছোড় বান্দা– বললেন, সম্ভব না।

অনেকটা নিশ্চিত হলাম ভিসা না পাওয়ার ব্যাপারে। মনে মনে ভাবলাম না পেলে কি? উন্নত শহর দেখার আনন্দ, সে তো দেখেছি। আর তাছাড়া লন্ডন সত্যি সত্যি না গেলেও যাদেরকে যাওয়ার সম্ভাবনার কথা বলেছি তারা প্রচারটা এমনভাবে করেছে যেন আমি নিশ্চিত যাচ্ছি বা চলেই গিয়েছি। যাদের বলিনি তারা যখন জিজ্ঞাসা করছিল অনেকটা ভাব নিয়ে বলছিলাম – এই আর কি, কাস্টমারের সাথে মিটিং আছে। কিন্তু আমার সমস্ত অশুভ কল্পনাকে পরাস্ত করে ১৩ই মে যখন জানতে পারলাম আমার ভিসা হয়েছে তখন খুব জোরে বলতে ইচ্ছে করছিল থার্টিন আসলে আনলাকী নয়। আমার শরীর ও মন কেমন যেন আনচান করছে। মনে হচ্ছে গর্ব ও আনন্দে দেহ-মন কিছুটা অনিয়ন্ত্রিত। নিজে নিজেই ভীষণ হাসতে ইচ্ছে করছে। ফোন দিলাম আমার বসকে, অফিসের বস কিন্তু তার নাম্বার ব্যস্ত থাকায় Reach করতে পারলাম না। কাল বিলম্ব না করে বাসার বসকে ফোন দিয়ে বললাম, সুখবরটা তোমাকেই প্রথম জানালাম।

মিটিং এর দিন ক্ষণ নির্ধারিত হলো কাস্টমারের সাথে যোগাযোগের পর। নির্ধারিত হলো এ ভ্রমনটি হবে ২০-২৭ মে' ০৮ অর্থাৎ মঙ্গল থেকে মঙ্গল। এক মঙ্গল বারে যাত্রা অন্য মঙ্গল বারে ফেরত। যদিও কাস্টমারের সাথে মিটিং এর বিষয়বস্তুর কারণে যাত্রাটি বেশ চ্যালেঞ্জিং ছিল। কিন্তু পরে পুরো ভ্রমনটিতে এমন মঙ্গল বর্ষণ হবে তা বুঝতে পারিনি। কাস্টমারের সাথে আমার মিটিং এ আমাদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে, সাথে আমার পুরো ভ্রমনটি হয়েছে আনন্দময়, নয়নাভিরাম, সময় ও অর্থের যথার্থ ব্যবহার। যাওয়া ও আসার দুইদিন বাদ দিলে আড়াই দিন মিটিং-এ ও আড়াই দিন ভ্রমনে কেটেছে লন্ডনের দিন গুলো। আমার লন্ডন ভ্রমন পরমানন্দময় হয়েছে লন্ডনে কিছু বাংলাদেশী ছাত্রের কল্যাণে। লন্ডন ভ্রমনটি যার কারণে সবচেয়ে সুখকর হলো তার নাম সাদ্দাম হোসেন। না না তিনি ইরাকের সাবেক প্রেসিডেন্ট নন, আমার ছোট ভাইয়ের বন্ধু সাদ্দাম হোসেন। আমার আড়াই দিন লন্ডন ভ্রমনের দুই দিন তিনি নিজেই সময় দিয়েছেন। মিটিং এর আড়াই দিনের বর্ণনা আমার বসকে দিয়েছি তাই তা পুনর্ব্যক্ত করলাম না।

বেড়ানোর জন্য বরাদ্দ আড়াই দিনের প্রথম আধা দিন ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ, দেখেছি লন্ডন ব্রীজ, লন্ডন আই, টেমস নদী, সিলেট হোটেল, পরিচিত হয়েছি সিলেটি পরিবারের সাথেও। তাদের হৃদয়ের ভাষাটি ছিল, ব্রিটেনে সুখে থাকলেও শান্তিটা ভাই দেশেই ছিল।

২৪ মে' ০৮ সাদ্দাম আমাকে দেখালো গ্রীনিচ মান মন্দির, পার্লামেন্ট বিল্ডিং, মিউজিয়াম ও অ্যাকুয়ারিয়াম। প্রতিটি দর্শনীয় স্থান সারাদিন দেখলেও বোধ হয় দেখার সাধ মিটবে না কিন্তু আমার সাধ মেটাতে হলো দ্রুত দর্শনের মাধ্যমে। এসব দেখার মাঝে ফোন দিলেন সোহেল, একজন প্রকৃত প্রবাসী ছাত্র। তিনি ফোন যেন ছাড়তেই চান না পাক্কা দেড় ঘন্টা কথা বলার পরও। কিন্তু আমার সঙ্গী সাদ্দামের মুখে কোন বিরক্তি নেই। আমি মুগ্ধ হলাম। লন্ডনে প্রবাসী ছাত্রদের পরিশ্রম দেখে যতটা সহানুভূতিশীল হয়েছি তার চেয়ে বেশী হয়েছি মুগ্ধ। অধিকাংশই কোন প্রতিষ্ঠানের ছাত্র হিসাবে ভর্তি আছে কিন্তু পড়া লেখার সুযোগ যথেস্ট হয়ে উঠে না দৈনন্দিন জীবিকা সংগ্রহের কারণে। এদের মত পরিশ্রমী ছাত্র আমি বাংলাদেশে দেখিনি।

অন্ততঃ সকাল ও রাতে নিজের খাবার নিজে তৈরী করে খাওয়া দেশীয় ছাত্রদের কাছে অসম্ভব ব্যাপার মনে হলেও প্রতিদিন তারা তাই করছে। উপরন্তু রয়েছে নিজের কাপড় চোপড় পরিষ্কার করা ও গৃহস্থালীর নানা কাজের অতিরিক্ত শারিরীক ও মানষিক চাপ। সব মিলিয়ে একটি কঠিন জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে আমাদের প্রিয় ছাত্র ভাইবোনরা। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল তাদের যদি একটু বেশী পড়াশুনা করার সুযোগ হত তাহলে সত্যিই তারা বাংলাদেশের অর্থনীতিতেও বিশেষ ভুমিকা রাখতে পারত। সেই সাথে বিশ্ব সমাজে আমাদের মর্যাদাও বাড়ত।

ভ্রমনের সময় ফুরিয়ে এল। ২৫শে মে' ০৮ সকালে মাহবুব (সাদ্দামের বন্ধু) আমাকে নিয়ে গেল তার কর্মস্থল Azda তে। ওর জন্য সংরক্ষিত ডিসকাউন্ট এর সুযোগ নিয়ে কিছু কেনাকাটাও করা গেলো। বিকেলে গেলাম Madame Toussaud- এর মোম প্রতিকৃতির যাদুঘরে। নিজেদের ঐতিহ্য সংরক্ষণে বৃটিশদের যত্নাদি দেখে মুগ্ধ হলাম। শত শত বিখ্যাত মানুষের হুবহু প্রতিকৃতি দেখে বোঝার উপায় নেই যে ওগুলো সত্যিকারের মানুষ নয়। হলিউড বলিউডের তারকা, বিশ্ব সেরা খেলোয়াড়, রাজনীতিবিদ, সংগীতজ্ঞ, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, নোবেল বিজয়ী বিখ্যাত মানুষদের পাশে দাঁড়িয়ে দর্শনার্থীদের ছবি তোলার প্রতিযোগিতা সত্যিই আনন্দময়। হাজার বছরের বৃটিশ ইতিহাস যেন কয়েক মিনিটেই পড়ে ফেললাম যাদুঘরে রক্ষিত ঘুর্ণায়মান গাড়িতে বসে। বৃটিশদের তৈরী অতুলনীয় যোগাযোগ ব্যবস্থার গল্প আমি অনেককে করেছি কিন্তু এর আগে যেটা কাউকে বলিনি, তা হল অল্প স্বল্প যে কয়টি দেশ ভ্রমন করেছি প্রতিবারই দু-চারদিন থাকার পরই নিজের দেশে ফেরার প্রচন্ড টান অনুভব করেছি। কিন্তু সত্যি বলতে কি এবারই প্রথম ফেরার সময় কেবলই মনে হয়েছে মানুষ যদি সারা দুনিয়ার যেখানে খুশি সেখানে ইচ্ছে মতো থাকতে পারতো তাহলে কতোই না মজা হত !

স্বপ্ন ছোঁয়ার স্বপ্ন

এ,কে,এম, গোলাম মহ্‌হী চৌধুরী
সিনিয়র অফিসার, কমার্শিয়াল, হেড অফিস

সবুজ খুবই ক্লান্ত । তার অবসন্ন দেহটা বাসের ঝাঁকুনিতে এদিক ওদিক ঝুঁকে পড়ছে । তবুও সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন । গত দু' বছরের আবদ্ধ জীবন তাকে অসম্ভব ক্লান্ত করে দিয়েছে । কতই বা বয়স হবে ওর । বড় জোড় পনের কি ষোল । এরই মধ্যে জীবনের কঠোর রূপ দেখেছে সে । যুদ্ধও করেছে সেই প্রতিকুলতার বিরুদ্ধে তার কিশোর দেহ আর মনটা নিয়ে ।

কিন্তু আজ তার কোন অভিমান নেই নিজের নিয়তির ওপর । আজ সে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে । নিজের গ্রামের বাড়ি । কতদিন যে মাকে দেখেনি! গত দু'টো বছর মায়ের কোন খোঁজ খবরও নেয়নি সে । খুব কষ্ট হয়েছে তার । মারও নিশ্চই অনেক কষ্ট হয়েছে। অনেক কেঁদেছেও নিশ্চয় । কিন্তু যত কষ্টই হোক এ দু'বছরে ছোট্ট একটা স্বপ্ন সাজিয়েছে সে তার মনে ।

এইতো গত কালও শহরের একটা ঘিনজি কারখানায় হাড়ভাঙ্গা খাটুনি দিয়ে শুরু হয়েছিল তার দিনটা । এতদিন গভীর রাতে অবসন্ন দেহটাকে টেনে হিঁচড়ে কোন মতে ফিরে আসত মেস নামের খুপড়ি ঘরটাতে । আসলে খুপড়ি বলতে যা বোঝায় তার চেয়েও নগন্য ছিল তার ঘরটা । জানালা বিহীন অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে এ কক্ষ । শুধু ঢোকার জন্য ছোট্ট একটা দরজা । প্রায়ই ঘরে ঢোকার সময় ওর কাছে মনে হত কারখানা নামক জেলটাতে সারাদিন থাকার পর বেরিয়ে এসে আবার অন্য কোন জেলে ঢুকছে । শক্ত কোন অপরাধের দাগী আসামী যেন সে ।

তবুও মনে জ্বলতো তার প্রদীপ শিখা । স্বপ্নের প্রদীপ । স্বপ্ন ছিল কাঙ্খিত আগামীর । বাড়িতে মাকে একা রেখে এসেছে সে । এসেছে না বলে পালিয়ে এসেছে বল্‌লে ঠিক হয় । সজ্ঞানে তার মা তাকে হাতছাড়া করতেন না । বাপহারা এক ছেলে সবুজ আর এক মেয়ে আলো। এদের কে কত কষ্টে বড় করেছেন তা কেবল তিনিই জানেন । আলোর বয়স যখন ষোল, দেখেশুনে বিয়ে দিয়ে দিলেন ভাল পাত্র দেখে । ধানি জমি বলতে যেটুকু ছিল তাও গেল কন্যার বিয়ের খরচ যোগাতে । বাকি রইল বসত বাড়িটুকু শুধু।

সবুজের পড়ালেখার ঝোঁক ছিল । একটু দেরীতে হলেও প্রাইমারী পার হয়ে হাইস্কুলে ক্লাস সেভেনে উঠেছিল ও । সালেহা বেগমের ইচ্ছে ছিল ছেলেকে লেখাপড়া করানোর । কিন্তু কত আর অভাব সহ্য করা যায় ! তাকে ভরণ পোষন করতে মাকে যে কতটা কষ্ট করতে হচ্ছিল তা চোখ এড়ায়নি সবুজের । অবশিষ্ট সামান্য যে গহনা ক'টা ছিল তাও বিক্রি হয়ে গেলো । কাজ নিলো মা অন্যের বাড়িতে । আর চুপ করে বসে থাকা যায় না। একদিন মাকে না জানিয়ে শহরে পাড়ি দিল সে ।

শহরে প্রথম ক'টা দিন ছিল খুবই কষ্টের । থাকার জায়গা নেই, কাজ নেই । অনাহারে অর্ধাহারে কেটেছে দিন । কিন্তু কাজ জোগাড় করতে সময় লাগেনি খুব বেশি । এভাবে শহুরে জীবনে ঢুকে গেল সে ।

সহকর্মীদের সাথে ভালই ভাব ছিল ওর । মাঝে মাঝে কৌতুহল বশতঃ জিজ্ঞেস করত ওদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে । ওদের কেউ কেউ বলত কাড়ি কাড়ি টাকা কামাবে । আবার কারো কারো জীবনে কোন পরিকল্পনাই ছিল না। ওদের সাথে নিজের ভেতরে জমে থাকা স্বপ্নগুলোকে তুলনা করত সবুজ ।

না, কাড়ি কাড়ি টাকা বানানোর স্বপ্ন ও দেখেনি । কিন্তু উদ্দেশ্যহীনও নয় সে । ওর খুব ইচ্ছা গ্রামে ফিরে যাবে কিন্তু খালি হাতে না । চাকরি করে মাসে মাসে সে কিছু টাকা সঞ্চয় করেছে । আরও বেশ কিছু টাকা জমা করে গ্রামে একটা দোকান দিতে চায় সে । দোকান আর মাকে নিয়ে হবে তার ছোট্ট জগত । ভোর সকালে উঠে দোকান

খুলবে সে। দুপুরে দোকান বন্ধ করে খেতে আসবে তার ছোট্ট কুটিরে। নিশ্চই তখন মা নিজ হাতে রান্না করা খাবার তুলে দেবে ওর পাতে। শহরের বিস্বাদ খাবারে অতিষ্ট হয়ে পড়েছিল সে। ধীরে ধীরে দোকানটাকে অনেক বড় বানায় সে স্বপ্নে।

এমন স্বপ্ন দেখতে দেখতে কাজে ভুল হয়ে যেতো তার। সুপারভাইজার এসে কিছুক্ষণ গালমন্দ করে চলেও যেত। সবুজ বুঝতে পারত না সে কি করবে। স্বপ্নের জগতটা বরাবরই একটু বেশি রঙিন। তার তুলনায় বাস্তবের রংগুলো বড় বেশি ফ্যাকাশে। তাই কাজে ভুল হওয়াটাই স্বাভাবিক। এটা ছিল তার জীবনের এক দুঃখময় অধ্যায়।

কিন্তু এখন তা অতীত। এখন সবুজ হতাশা আর কষ্টের সীমার বাইরে। চাকরি ছেড়ে দিয়েছে সে। তার সঞ্চিত অর্থ নিয়ে সে স্বপ্ন সাজাতে চলেছে। গতকালই মায়ের জন্য একটা শাড়ি কিনেছে। বাজার থেকে ভাল দেখে পান-সুপারি কিনেছে।

চলন্ত বাস হঠাৎ ব্রেক কষায় ঘুম ছুটে গেল সবুজের। সে বাসের জানালা দিয়ে আকাশটা দেখল। শরতের আকাশটা রোদে গনগন করছে। তার মনের স্বপ্নগুলোও বোধ হয় রোদেলা আকাশের মত। আর সূর্যটা বোধ হয় তার মা। না শুধরে নেয় সে- মা হবে তার চাঁদের মতো।

বাস থেকে বাড়ির কাছের বাজারটায় নামতে নামতে প্রায় বিকেল হয়ে এল। ঘোষের দোকান থেকে এক কেজি সন্দেশ কিনে নিল সে। এর পরপরই গাঁয়ের পথ ধরল। এখান থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার রাস্তা। ধানক্ষেত আর মেঠোপথ পাড়ি দিয়ে তার সামনে পড়ল সেই পরিচিত হাওড়। প্রতি বছর বর্ষায় পানি আসে এ হাওড়ে। পানি থাকে আশ্বিন-কার্তিক মাস পর্যন্ত। হাওড়ের তীরে এসে একটা ডিঙিতে চড়ে বসল সবুজ। মাঝি তার খুব পরিচিত। রহমত চাচা। তাকে দেখে যেন ভুত দেখার মত চমকে উঠলেন তিনি।

- তোমারে চেনা চেনা লাগতাছে ! তুমি সোলেমান মিয়ার পোলা সবুজ না?

- হ, চাচা।

- এ্যাদ্দিন কই আছিলা মিয়া ? খোজ নাই, পাত্তা নাই।

- শহরত আছিলাম চাচা। মে---লা-- দুর।

- শহরত গিয়া গাওরে বেমালুম ভুইলা গেছিলা ? তোমার মা তোমারে মরনের সময় কেবল একবার দেখতে চাইছিল। সেই সাধ পূরণ হইল না বেচারীর। মরণের সময় পোলার হাতের পানি বেচারীর ভাগ্যে জুটল না। আ-হা- রে---

শেষের কথাগুলো তীরের মত এসে বিঁধল সবুজের বুকে। তখনও সে ঠিক হয়ে বসেনি নৌকায়। টলতে টলতে পড়ে যাচ্ছিল সে। হাত পা যেন অবশ হয়ে গেছে। মুর্চ্ছা যাওয়ার আগে একবার শুধু অসপষ্ট স্বরে মা-- বলে ডাকল।

যখন জ্ঞান ফিরল তখন ও পৈত্রিক ভিটার বারান্দায়। কোন মতে উঠে বসল সে। এই সেই ঘর-যার সর্বত্র ছিল তার মায়ের পদচারনা। সবখানে তাঁর মমতা মাখানো হাতের ছোঁয়া। শুধু মা নেই। নিষ্ঠুর নিয়তি আর কঠিন বাস্তবতা তাকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। এত ছোট্ট একটা স্বপ্নও বুঝি তার বাস্তব হলনা!

আচ্ছা সবুজ কি কাঁদছে। না তার চোখে পানি নেই; শুধু একটা দলা পাকানো দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তার বুক চিরে। ভাবহীন দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকালো সে। হেলে পড়া সূর্যটা কালো মেঘে ঢেকে গেছে। আকাশটাও মেঘলা। কোন আর্তচিৎকার নয় কিংবা হাহাকার নয়। সবুজ মনে প্রাণে চাইল এক পশলা বৃষ্টি এসে তার চোখের স্বপ্নগুলোকে ধুয়ে দিয়ে যাক। স্বপ্ন বড় বেদনাময় !

দিশে হারা প্রেম পত্র

প্রিয় মিস রিনা,

আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে গত ০৮ই জানুয়ারী মঙ্গল বার থেকে আমি আপনার প্রেমে পড়েছি। ৩১ই জানুয়ারী বৃহস্পতি বার বিকেল চার ঘটিকায় আমাদের যে মিটিং হয়েছিল সেখানে আপনার উপস্থিতি আমার এই সিদ্ধান্তকে ত্বরান্বিত করেছে।

আমি নিজেকে আপনার সামনে একজন সম্ভাবনাময় ভালোবাসার পাত্র হিসেবে উপস্থাপন করছি।

আমাদের এই প্রেমকে প্রথম তিন মাসের প্রবেশন পিরিয়ডে রাখতে পারি, আমাদের প্রেমের দক্ষতা ও গভীরতা বিবেচনা করে পরবর্তী কালে স্থায়ী রূপ দেওয়া যেতে পারে। অবশ্যই প্রবেশন সময় শেষ হওয়ার পর প্রয়োজন অনুযায়ী প্রেমের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষন ও কার্যকারিতা যাচাই প্রকল্প গ্রহন করা হবে, যাতে আমরা সফল ভাবে প্রেমিক-প্রেমিকা থেকে স্বামী-স্ত্রী হতে পারি।

প্রথম দিকে আমরা - চা-কফি, খাওয়া-দাওয়া, এক সাথে ঘোরা-ফেরা এসবের খরচ দুই জন সমান ভাগে বহন করব। পরবর্তী কালে আপনার দক্ষতা বিবেচনা সাপেক্ষে আমি খরচের একটা বড় অংশ বহন করতে পারি। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে আমার মন অনেক বড় কারণ আমি আপনার খরচের খাতের দিকে সব সময় লক্ষ্য রাখছি। অনুগ্রহপূর্বক চিঠি পাওয়ার ১৩৭ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করবেন।

অপারগতায়, পরবর্তী কোনো নোটিশ ব্যতীত এই প্রস্তাব বাতিল বলে গন্য হবে এবং আমি অন্য কাউকে বিবেচনা করতে বাধ্য হব।

আপনি যদি এই প্রস্তাব গ্রহন করতে সম্মত না হন, তবে এই চিঠিটি আপনার বোনকে ফরওয়ার্ড করলে (পৌঁছে দিলে) অত্যন্ত আনন্দিত হব। পত্র লেখার শেষ প্রান্তে সদ্য ফোটা লাল গোলাপের শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা দিয়ে বিদায় লগ্নে অনেক আশা নিয়ে আপনার অপেক্ষায় রইলাম।

শুভেচ্ছান্তে-

মোঃ ইউনুছ আলম (স্বপন)

বিভাগ - নিটিং, অপারেটর, পিন নং-১৯৬, অবনী টেক্সটাইলস্ লিঃ

(সংগৃহীত)

কোন এক হোটেলে

সংগ্রহে ঃ নিজাম খান

সুপার ভাইজার, জুনিপার এমব্রয়ডারীজ লিঃ

গ্রাম থেকে এক লোক এসে শহরের এক রেস্তোরায় ঢুকেছে খাবে বলে । সহজ সরল লোকটার পকেট অতটা ভারী নয় । ম্যানেজারের সামনে দিয়ে ভিতরে ঢোকার সময় সে লক্ষ্য করল একজন কাস্টমার খেয়ে এসে বিল পরিশোধ করছে । ম্যানেজার জানতে চাইলে বয় বলল- নাস্তা ৬০ টাকা আর পিরিচ ভাংগা ৮ টাকা।

এর পর বয় এসে লোকটার কাছে জানতে চাইলো, "স্যার আপনি কি খাবেন ?"

লোকটা বলল, "আমাকে ঐ পিরিচ ভাংগাই দাও।"

আদর্শ গার্মেন্টস ব্যাবিলন

মোঃ শাহীন রেজা
কিউ.সি (ইন্সপেক্টর), পিন নং ১২৪২০, ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিঃ

গার্মেন্টস শব্দটা শুনলে অন্যান্য সবার মত আমি নিজেও ভাবতাম, গার্মেন্টস এর পরিবেশ সবচেয়ে নোংরা, পরিশ্রম অনেক বেশী এবং পরিশ্রমের তুলনায় বেতন অনেক কম। শিক্ষার মূল্যায়ন এখানে নেই বললেই চলে। হ্যাঁ, এর অনেকটাই সত্যি। আমি ব্যাবিলন গার্মেন্টস-এ আসার আগে যে সব গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে চাকরী করেছি সে সব গার্মেন্টসের ক্ষেত্রে এ কথাগুলো বাস্তব। মার্কেটিং এর চাকরী দিয়ে শুরু হয় আমার কর্ম জীবন। বেশ ভালোই ছিলাম। হঠাৎ একদিন সড়ক দুর্ঘটনায় আমি আহত হই। এ সময় প্রায় ৩ মাস কোন কাজ করতে পারিনি। আমার মেয়ের বয়স তখন ১ বছর ৫ মাস। ঢাকা শহরে কেউ নেই আমাকে সাহায্য করার মত। ঠিক এমন সময় আমার স্ত্রী সিদ্ধান্ত নেয় সে চাকরী করবে ব্যাবিলনে। আগেই বলেছি আমি নিজে গার্মেন্টসে চাকরীটাকে মনে করতাম সবচেয়ে নিম্ন শ্রেনীর চাকরী। কিন্তু একজন মহিলা বাচ্চা নিয়ে চাকরী করবে এমন সুযোগ তখন কেবল ব্যাবিলন গার্মেন্টসে ছিল। সে প্রায় ৫ মাস চাকরী করে। আমার স্ত্রীর মুখে ব্যাবিলনের কথা শুনে আমারও খুব ইচ্ছে হয় গার্মেন্টসে চাকরী করার।

ফেব্রুয়ারী মাসের ১ তারিখ ব্যাবিলনের গেটে গিয়ে দাঁড়াই। একজন কিউ.সি. সুপারভাইজার স্যার এসে আমার সাথে কথা বলে আমাকে ভিতরে নিয়ে যান। ভিতরে গিয়ে প্রথমে পরীক্ষা দিই। পরীক্ষার পর ম্যানেজার স্যারের সাথে কথা বলার সময় তিনি আমাকে "আপনি" সম্বোধন করে কথা বলেন। খুবই ভালো লাগে। তারপর যাই আমার কর্মস্থলে। আমি অবাক হই এখানেও একই অবস্থা, একজন সুপারভাইজারও একজন হেলপারকে আপনি সম্বোধন করে কথা বলেন। কেউ বলে দেওয়ার আগেই বুঝে ফেলি এখানকার পরিবেশের অবস্থা।

কিছুক্ষন পরে যাই টয়লেটে হাত মুখ ধোয়ার জন্য। একটা ফ্লোরে যতগুলো শ্রমিক কাজ করে সংখ্যায় তার তুলনায় অনেক বেশী এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সব টয়লেট। লাঞ্চ এর সময় হলে আমার পাশের একজন কিউ.সি. ইন্সপেক্টর আমাকে নিয়ে যান ডাইনিং এ। ডাইনিং এ ঢুকতেই চোখ পড়লো ক্যান্টিনের দিকে। মাত্র ১০ টাকায় ভাত খাওয়া শেষ করলাম। হাতে সময় থাকায় উৎসাহ নিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকি। ওয়ার্কার্স ডাইনিং এর পাশেই ম্যানেজার ডাইনিং। তার পাশেই ষ্টাফদের। সুসজ্জিত ওয়ার্কার্স ট্রেইনিং সেন্টার, ষ্টাফ ট্রেইনিং সেন্টার এবং মহিলা ও পুরুষের জন্য আলাদা আলাদা নামাজের স্থান। নয়তলায় সর্বশেষ দর্শনীয় স্থান ফুলের বাগান। এখান থেকে ফ্লোরে নামতেই ম্যানেজার স্যার ডাক দিলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন আমার মেয়ের কথা। আমি তাকে দেখেছি কিনা। তিনি দেখতে যাওয়ার জন্য বললেন। গেলাম ২য় তলায়। শিশু যত্ন কেন্দ্রের ভিতরে ঢুকে দেখলাম কতগুলো বাচ্চা সবাই নিজ নিজ খেলায় ব্যস্ত। রুমটাও অনেক বড়। সেখান থেকে বের হয়ে দেখলাম পাশেই মেডিক্যাল সেন্টার। নিচ থেকে উপরে উঠতেই প্রতি ফ্লোরের গেটে দেখলাম বিশুদ্ধ খাবার পানির ট্যাঙ্ক। প্রতি ফ্লোরে লাইনে লাইনে ফার্স্ট এইড বক্স, অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা। তাছাড়া আমার খুবই ভালো লাগে এই গার্মেন্টসে বিশাল তিনটি সিঁড়ি, তারপরও দুইটি লিফট। আমার মনে হচ্ছিল লিখতে বসার আগে ব্যাবিলনের সব কথাই লিখে ফেলবো। কিন্তু অনেক কিছু লিখে প্রকাশ করা যায় না। প্রকাশ করতে না পারলেও আমি আমার উপলব্ধি দিয়েই বুঝি এটাই আমার প্রিয় গার্মেন্টস, যাদেরকে দেখে অন্য সব গার্মেন্টস মালিকদের শিক্ষা নেয়া উচিৎ।

লাঞ্চের সময় শেষ হয়ে গেলে আবার কাজে ফিরলাম। চলে গেল একটি মাস। মার্চের ৭ তারিখ পে-স্লিপ পেলাম। খুবই আনন্দ হল। আমি বেতনের বিনিময়ে চাকরী করি। আমার কর্মস্থলে যথা নিয়মে আমাকে আসতেই হয়। তাহলে হাজিরা বোনাস এতো আমার বাড়তি পাওয়া। কিছুদিন পরে শুনলাম আমাদের প্রীতিভোজের কথা। এটা উপলক্ষে লটারীর আয়োজন করা হলে আমি কিছু টিকিট ক্রয় করি। চলে এলো প্রীতিভোজের দিন। খুবই মজা হলো এই দিনে। আমাদের সব শ্রমিক নাচ, গান, অভিনয়, যে যা পারে সব দিয়ে সারা দিন বেশ মজা করা হলো। গার্মেন্টসে যারা চাকরী করে এদের এই অল্প বেতনে একটি রঙ্গিন টিভি বা স্বর্ণালংকার ক্রয় করা খুবই কষ্টকর। এই প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে খুব সহজেই এগুলো লটারীর মাধ্যমে পেয়ে খুশিতে আত্মহারা হয়ে বাড়ি ফিরেন অনেকেই, এমনকি আমিও।

কয়েকদিন পরে আমার ফাইল উঠলো। ৪০০ টাকা বেতন বেড়েছে। আমার কর্ম মূল্যায়নে আমি সন্তুষ্ট হলাম। কর্মের মধ্যে দিনের পরিক্রমায় এসে গেলো আমাদের বাৎসরিক ম্যাগাজিন প্রকাশের সময়। ওয়েলফেয়ার ম্যাডাম বললেন, সবাই লেখা দিতে পারবেন। বাসায় এসে খাতা কলম নিয়ে বসে পরলাম কিছু লেখার জন্য। ভাবতে ভাবতে চলে গেলো ১টি ঘন্টা কি নামকরন করবো আমার এই লেখার। এই ব্যাবিলন গার্মেন্টস শ্রমিকদের প্রাপ্য সকল চাহিদা পূরণ করে। বায়ারদের চাহিদা পূরনের পরেও বাড়তি কিছু নিশ্চয়তা প্রদান করে। সরকার যে শ্রম আইন করেছে তা পুরোপুরি মেনে চলে এবং আমার সবচেয়ে ভাল লাগার বিষয় এখানে মালিক শ্রমিক দু পক্ষের মধ্যে ভাল সম্পর্ক। সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে ছায়ার মতো আছেন মালিকগন আমাদের পাশে। এই সব দিক বিবেচনা করে আমার লেখার নামকরন করলাম, "আদর্শ গার্মেন্টস্ ব্যাবিলন"।

গল্প লেখার গল্প

এমদাদুল ইসলাম
পরিচালক, বিপণন ও মান নিয়ন্ত্রণ, ব্যাবিলন গ্রুপ।

ব্যাবিলন কথকতা - এর তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশের সময় ঘনিয়ে এসেছে। সোহেলী জানায় কবিতাতো জমেছে অনেক। কিন্তু গদ্য লেখা কোথায় ? আরো যে চাই। সাইফুল হক মোটামুটি চাপই দিচ্ছে আমাকে একটা লেখা দেবার জন্য। আরে নিজেরই কি লেখার ইচ্ছে হয় না! সেই গত সংখ্যা বেরিয়ে যাওয়ার পর থেকেই ভাবছি পরের সংখ্যার জন্য কিছু লিখি। ভেবেছিই শুধু - হয়নি। সাইফুল হকের হুঁশিয়ারীতে হুঁশ হয় এখন।

এতদিন ভেবেছি বসলেই হবে। এখন বসে দেখছি ব্যাপারটা মোটেই সহজ নয়। কথায় বলে শুরু করলেই কাজের অর্ধেক। শুরু হলে শেষও হয়। মানি। কিন্তু শুরুটার শুরু করাই বেশ শক্ত দেখছি।

এর আগে সংগীবিহীন ভাবে ভোরবেলা যখন হাঁটতাম শরীর ঠিক রাখার জন্য তখন কিন্তু না চাইতেই নানান প্লট এসে মাথায় ভীড় জমাতো। হাঁটতে হাঁটতে কত মজাদার সব লেখাই না লিখেছি মনে মনে তখন। ভেবেছি এর যে কোন একটাকে কোনমতে কলমের মাথা থেকে কাগজে নামিয়ে ফেলতে পারলেই তো কেল্লা ফতে। কিন্তু যা ভাবি তা যদি কোন কালে হয়!

গল্প লিখতে চেয়েছিলাম বুঝলেন! কবিদেরকে সমীহ করি কারণ কাব্য রচনা আমাকে দিয়ে সম্ভব নয়। নীতি কথা, স্মৃতি কথা, ভ্রমন চরিৎ - এ সব তুলনামূলক ভাবে সহজ মনে হয় আমার কাছে। কিন্তু গল্প লেখা ! সে খুব কঠিন কাজ - অন্ততঃ আমার কাছে। তাই ভেবেছিলাম সবাইকে ভরকে দেয়া যায় এমন একটা গল্প যদি হয়ে যেতো। কিন্তু আসছে না। সারাজীবন কত গল্পের বই গুলে খেয়েছি অথচ আজ আমার অলেখা গল্পরা যে কোথায় লুকালো।

বিশ্বাস করবেন কি ? এই আমি এক সময় গল্প একটা লিখেছিলাম সত্যি সত্যি ? সেই গল্প আবার ছাপাও হয়েছিল কোন এক পত্রিকায়! চট্রগ্রামে দেশ গার্মেন্টস -এ চাকুরী করি তখন। আমার এক উর্ধ্বতনের পিড়াপীড়িতে লিখেছিলাম একটা ছোট গল্প। তবে ভাববেন না একশভাগ মৌলিক ছিল লিখাটা। বিদেশী এক পত্রিকায় একটা গল্প পড়েছিলাম। সেই ধারনাটা ধার করে দেশী ধাঁচে লিখেছিলাম একটা কিছু। তা মজা হয়েছে এই যে পরের সংখ্যায় চিঠি পত্রের বিভাগে একজন পাঠিকা আমার গল্পের প্রশংসা করে চিঠি দিয়েছিলেন সম্পাদকের কাছে। সাথে আবার অনুরোধ ছিল লেখককে যেন তার ধন্যবাদ পৌঁছে দেয়া হয়। বুঝতেই পারছেন দারুন পুলকিত হয়েছিলাম এতে। সম্পাদকের মন্তব্য পড়ে বেশ আশান্বিতও ছিলাম। উনি লিখেছিলেন সত্বর লেখককে পাঠিকার ধন্যবাদ পৌঁছে দেয়া হবে। বিশ্বাস করবেন ঐ ধন্যবাদ কোনদিনই পাইনি আমি ? অবশ্য এই দুঃখ বেশীদিন ধরে রাখতে হয়নি আমাকে। কারণ ক'দিন পরেই জানতে পেরেছিলাম পাঠিকাটি আর কেউ নয় আমারই সেলাই বিভাগের একটি মেয়ে সেলাই কর্মী। আমারই অধীনে কাজ করে। বুঝুন লেখকের তখন কি অবস্থা। বুঝলাম-লেখককে ধন্যবাদ পৌঁছানটা লক্ষ্য ছিল না; সম্ভবত লেখিকার চিঠিটা তার নাম সহ ছাপবার ইচ্ছেটাই ছিল মুখ্য।

এই ঘটনার পর তরুন গল্পকারের করুন মৃত্যু হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তা হল না। গল্প পড়ার নেশা অনেক দিনের। যে গল্প পড়ে ভাল লাগে পড়ার পর মনে হয় এমনতো আমিও পারি।

তখন মাঝে মাঝে বাস যোগে ঢাকা চিটাগাং যাতায়াত করতাম। ঐ রকম বাস যাত্রী হিসেবে একদিন চলতি পথেই একটা গল্পের প্লট এলো মাথায়। লিখে ফেললাম একটা লাভ স্টোরি, মানে ভালবাসার গল্প। লেখার পর টুকি টাকি সংশোধনের পর মনে হল অবশেষে দারুন একটা কিছু লিখে ফেলেছি। পত্রিকাতো লুফে নেবেই, আর একজন কেন অনেক পাঠিকাই (লক্ষ্য করুন পাঠকদের কথা তখন আমার মাথায় আসেনি) তাদের প্রশংসা পত্রস্থ করবে। গল্পটা পত্রিকায় পাঠাবার আগেই একটা ঘটনা ঘটে গেল। ঘটনা না বলে দুর্ঘটনা বলাই ভাল।

একদিন কি উপলক্ষ্যে আমার ভাই-বোনেরা আমাদের বাসায় বেড়াতে এলো। ভাবলাম গল্প প্রকাশের আগেই যদি কিছু প্রশংসা কামিয়ে নেয়া যায় তো মন্দ কি ? কাজেই কায়দা করে পান্ডুলিপিটা টেবিলের উপর দৃষ্টিকাড়ে এমন ভাবে রেখে দিলাম। ঠিকই আমার মেজ ভাইটির নজরে পরে গেল লেখাটা। জিজ্ঞেস করল, এটা কি ভাইয়া ? আমি একটু আমতা আমতা করে বললাম, এমন কিছু না - এই একটা গল্প লিখেছিলাম আর কি বেশ আগে। ও বলল, একটু পড়ি ? আমিতো তাই চেয়েছিলাম। ও পড়তে লাগল। আর আমি অন্যমনস্ক হওয়ার ভান করে একটু দুরে পাশের ঘরে সরে গেলাম। কিছুক্ষন পরে ছোট ভাইটি চিৎকার করে উঠল, এটা কি লিখেছ ভাইয়া ? মোটেই ভাল লাগল না। খুব হালকা লেখা। তোমাকে মানায় না। আমার ভাইয়ের সাথে সুর মিলালো অন্যরাও। এমনকি আমার স্ত্রীও।

কেমন বুঝলেন ? আপনাদেরও হয়েছে নাকি এমন অভিজ্ঞতা? এরপর দীর্ঘকাল আমি আর গল্প লেখার চেষ্টা করিনি। ওহ ! 'ব্যাবিলন কথকতা'য় আমার লিখার কথা মনে পরে গেল বুঝি? ঐ ফ্রন্টেও আমার অভিজ্ঞতা খুব মধুর নয়। প্রথম সংখ্যায় ব্যাবিলনের ইতিহাস গিয়েছিল। দ্বিতীয় সংখ্যার মোড়ক উন্মোচনের অনুষ্ঠানে সেই জন্যে আবার আমাকে পুরস্কৃত করেছিল বিচারক প্যানেল। এই প্রসংগে আমার একজন শুভাকাংখী বন্ধু সুন্দর মন্তব্য করেছিলেন। বলেছিলেন, লেখাটা আপনার মোটামুটি হয়েছে। তবে আপনি যঘন্য কিছু লিখলেও পুরস্কার পেয়ে যেতেন। ইংগিতটা খুবই স্পষ্ট তাই না ? তিনি আমাকে একটা পরামর্শও দিয়েছিলেন। না, লেখা ছেড়ে দিতে বলেননি। বলেছিলেন আমার লিখা পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন যোগ্যতার বাইরে থাকা উচিৎ ছিল। আর এ ব্যাপারে আমার স্বউদ্যোগ হত সুরুচিপূর্ণ। খুবই যুক্তিযুক্ত কথা অথচ দেখুন আগে আমার মাথায়ই আসেনি। বন্ধুটিকে তেতো মুখে ধন্যবাদ দিয়েছিলাম পরামর্শের জন্য। মন খুলে কিনা এ ব্যাপারে দিব্যি দিতে পারবনা।

দ্বিতীয় সংখ্যার লেখাটা নিরাপদে পার পেয়ে গেছে ভেবেছেন বোধহয়? আরে নাহ্‌। হ্যাঁ সেই টিনাকে নিয়ে লেখাটার কথাই বলছি। আমার এক ভীষন প্রিয় ও বিজ্ঞ বন্ধু লেখাটা পড়ে যে মন্তব্য করেছেন সেটা না উল্লেখ করলেই ভাল হত। কিন্তু পাছে উনিই একদিন ফাঁস করে দেন তাই আমি আগে ভাগেই বলে দিচ্ছি। তার মন্তব্য ছিল- এমদাদ ভাই, খুব আগ্রহ নিয়ে আপনার পত্রিকাটি খুললাম। ততোধিক আগ্রহ নিয়ে আপনার গল্প পড়তে লাগলাম। অর্ধেকটা পড়ার পর মনে হল আর পড়ার দরকার নেই। এমন কাঁচা লেখা আপনি কিভাবে লিখলেন ?

লজ্জা-ঘেন্না থাকলে এর পর বোধহয় নিতান্ত বোধহীনরাই স্পর্ধা করবে পুরনো কীর্তির পুনঃরাবৃত্তির। আমার লজ্জা ঘেন্না বোধে ঘাটতি থাকতে পারে কিন্তু সরাসরি নিন্দা হজমে বেশ অরুচী। তাই সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেলাম- লিখব না আর। পরে অবশ্য ভেবেছিলাম- ব্যাবিলন কথকতা -এর পাঠক-পাঠিকারা আমার ভাই বা বন্ধুর মতো অতটা ঠোঁট কাটা নাও তো হতে পারেন। আর হলেও ওদের সুযোগ কই প্রতিক্রিয়া জানাবার। এই পত্রিকায় মতামত প্রকাশের কোন বিভাগও নেই যে সেখানে কেউ সমালোচনা পত্রস্থ করবে।
তার মানে লেখা একটা চেষ্টা করা যেতে পারতো।
কিন্তু এখন বড্ড দেরী হয়ে গেল যে !

আমার বাংলা

মরিয়ম ফারহাজ
কাটিং ম্যান, পিন নং-৪৪৪
ব্যাবিলন ক্যাজুয়ালওয়্যার লিঃ

আমি রাতের আঁধার দেখেছি
দেখেছি অন্ধকার কালো,
আমি নীল আকাশ দেখেছি
দেখেছি দিনের আলো।

আমি নদীর স্রোত দেখেছি
দেখেছি ভাঙ্গা গড়া,
আমি বালুর চর দেখেছি
দেখেছি বসত গড়া।

আমি পিতার শাসন দেখেছি
দেখেছি আদর-ভালবাসা,
আমি মায়ের মুখ দেখেছি
সেখানে স্বস্তির আশা।

আমি মানুষের দুঃখ দেখেছি
দেখেছি লাঞ্ছিত হওয়া,
আমি মানুষের সুখ দেখেছি
দেখেছি আপনারে খুঁজে পাওয়া।

আমি শ্রমিকের শ্রম দেখেছি
দেখেছি ঘাম ঝরা,
আমি মালিকের ভালবাসা দেখেছি
দেখেছি মানুষ গড়া।

আমি দেখেছি আমার বাংলা
দেখেছি বাংলার রূপ,
তাইতো হাজার কষ্টের মাঝে
পাই আনন্দ-সুখ।

কবিতা তুমি

মঞ্জুরুল করিম
কিউ, সি, পিন নং-১১৩৭২
অবনী নীটওয়্যার লিঃ

কবিতা তুমি বাধা বন্ধনহীন দস্যি মেয়ে,
প্রেম ভালোবাসায় পূর্ন, চঞ্চলা ঝর্নাধারা,
তুমি শত বছরের কুসংস্কারের বুক চিড়ে
উঠে আসা একমুঠো সোনারোদ,

শোষকের বুকে বিষ জ্বালা তুমি,
তুমি অত্যাচারির মরন ব্যধি,
তোমার দৃপ্ত পদভারে ভাঙ্গে
নিয়ম কালাকানুন-শৃংখল,

ভোরের কুয়াশার বুক চিড়ে ওঠে
তোমার প্রতিবাদী রক্তীম আভা,
ক্ষুধিতের সান্ত্বনা তুমি,
নিপিড়িতের গন বিপ্লব।

ধ্রুবতারার মতো জ্বল জ্বল করো
আঁধারে ফুটাও আলো।
দুর্দিনে তুমি পথের পিদিম, বাঁধ ভাঙ্গা ঢেউ,
সর্বহারার সোচ্চার কণ্ঠ।

বন্ধু একা নও

শরীফা আক্তার ঝর্ণা
জুনিঃ অপারেটর, পিন নং -১৩০৮৩
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিঃ

বৃষ্টিতে আজ ভিজবো আমি
মনে মেখে রং,
নাচ করবো, গান করবো
শুনবো না বারণ।

ঠান্ডা লাগুক জ্বরটি আসুক
করুক মাথা ব্যথা,
বন্ধু আমায় ফোনে বলবে
ঔষধ খাওয়ার কথা।

সারবে না জ্বর ঔষধ খেয়ে
করতে হবে টেস্ট,
রিপোর্ট নিয়ে বন্ধু আমার
বলবে নিতে রেস্ট।

ব্যাবিলনে কাজ করতে
বেলা বোধ হয় শেষ,
বন্ধু আমার আবার একা
ভাবতে লাগে বেশ।

ভয় পেওনা বন্ধু আমার
থাকবো তোমার পাশে,
চিন্তা মুক্ত থেকো তুমি
ব্যাবিলন আছে সাথে।

স্বাধীনতা

আব্দুল হামিদ
সহঃ ম্যাকানিকস্, পিন নং-৩৮০
জুনিপার এমব্রয়ডারিজ লিঃ

দশ বছরের ছোট্ট খোকন
প্রশ্ন করে কাল,
বাংলাদেশের ঐ পতাকার
মধ্যে কেন লাল?

আঁচল দিয়ে অশ্রু মুছে
মা কেঁদে কয়,
ত্রিশ লক্ষ প্রাণ দিয়ে
দেশটি স্বাধীন হয়।

এই দেশটি স্বাধীন করতে
অনেক রক্ত ঝরে,
বীর বাঙ্গালী রক্ত দিয়ে
ঐ পতাকা গড়ে।

মায়ের কথায় কিশোর খোকন
শপথ করে বলে,
আমিও মা রক্ত দেব
দেশের প্রয়োজন হলে।

পাওয়া

হামিদা ফেরদৌস (জিসান)
কিউ.এ, পিন নং-১৪১৮০
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিঃ

দুঃখ আমায় দুঃখ দেয়নি,
দিয়েছে দুখের সুখ।
কষ্ট আমায় নিরাশ করেনি,
রেখেছে কাজে অটুট।

বেদনা আমাকে ব্যথা দিয়েছে
ব্যথিত হইনি আমি।
কান্নার সাথে মিতালি করেছি,
কাঁদতে পারিনা আমি।

ধৈর্য্যকে আমি জয় করেছি,
সবকিছু সহ্য করে
ভালবাসার দুয়ার বন্ধ করেছি
মিথ্যার ছোবল সয়ে।

নিষ্ঠুরতা আমায় শক্তি জুগিয়েছে
আবেগ নিয়েছে কেড়ে।
একাকিত্বে হয়েছি সংগীবিহীন
কিন্তু উদ্যম গিয়েছে বেড়ে।

সবুজ ঘেরা গাঁও

মোঃ মিন্টু মিয়া
কাটারম্যন, পিন নং-৭৪৫
ব্যাবিলন ক্যাজুয়ালওয়্যার লিঃ

সবুজ ঘেরা পল্লী আমার
সবুজ ঘেরা গাঁও,
ছোট্ট নদীর বুকটি ভরা
রঙ্গিন পালের নাও।

ছোট্ট-গাঁয়ে ছোট্র-নদী
ছোট্ট-পরিবেশ,
তাইতো সবাই মিলেমিশে
আছি সদাই বেশ।

ফল-ফসলের ছড়াছড়ি
আমার গাঁয়ের মাঠে,
চারদিকে সব রাশি রাশি
দেখেই সময় কাটে।

আমার গাঁয়ে ফল-ফলালির
নেইকো কোন শেষ,
তাইতো সবাই মিলেমিশে
আছি সদাই বেশ।

আমার ইচ্ছে

মোঃ ফরহাদ হোসেন
পিন নং-৫২৪
অবনী ফ্যাশন্স লিঃ

মাগো তোমার দোয়ায় যেনো অনেক বড় হই
দ্বীনি এলেম শিখব পড়ে কোরান, হাদিস ও বই।
তোমার ছেলে আলেম হবে, হবে মুত্তাকিন
কুফর বাতিল ধ্বংস করে গড়বে নতুন দ্বীন।
থাকবে যেথায় শান্তি ও সুখ, রহম অবীরত,
খোদার বিধান কায়েম হবে শান্তি হবে কত !
গরীব-দুঃখী হাসবে হেথায় দুঃখ হবে দুর,
সুখ সাগরে ভাসবে সবাই হৃদয় ভরপুর।
মাগো তুমি দোয়া কর এমন সমাজ গড়তে,
অন্যায় আর পাপ অনাচার সবকিছু দুর করতে।

তুমি কি চাওনা

তানিয়া আক্তার (পান্না)
সুইং লাইন নং-৪
ব্যাবিলন ক্যাজুয়ালওয়্যার লিঃ

তুমি কি চাওনা আঁকা বাঁকা নদী ও ছায়া ঘেরা গ্রাম,
উদাস দুপুরে নুন মেখে খেতে ডাঁশা ডাঁশা আম ?
তুমি কি চাওনা সেই কাশবন আর হাসুখালী বিল,
যেখানে উড়ছে ডানা মেলে বক, মাছরাঙা, চিল।
তুমি কি চাওনা শীতের সকালে পাটিসাপটা, ভাপা ও পুলি,
ভালো লাগে নাকি মায়ের বকুনি ও মধুমাখা বুলি ?
তুমি কি চাওনা লিখতে কবিতা, জারি, পালাগান,
মায়ের ভাষাতে লিখে কথামালা জুড়াতে এ প্রাণ ?

হারানো দিন

মোঃ মোক্তার হোসেন
ট্রেনিং সহকারী অপারেটর
সেকশন- ডাইং, পিন নং-৪৯৭
অবনী টেক্সটাইলস্ লিঃ

কতদিন হলো গল্প শুনি না
খাই না মায়ের হাতে,
কতদিন হলো জোসনা দেখি না
মেঘ বিহীন কোন রাতে।

কতদিন হলো মেঠো পথে আর
শুনি না রাখালের বাঁশি,
কতদিন হলো দীঘির জলে
দেখি না চাঁদের হাসি।

কতদিন হলো গাছের ছায়ায়
খেলি না ডানগুলি,
আমার খেলার সাথীরা আজ
আমায় গেছে গো ভুলি।

এখন একা ঢাকায় থাকি
নেই কেহ আর পাশে
নিজ দেশেতে থেকেও যেন
আছি এক পরবাসে।

ব্যাবিলন গ্রুপের বিভিন্ন কার্যক্রমের ছবি

"কর্পোরেট সোস্যাল রেসপন্সিবিলিটি"-এর
পদক গ্রহণ করছেন ব্যাবিলনের মাননীয় পরিচালক

শ্রম ও কর্মসংস্থাপন মন্ত্রনালয় কর্তৃক মহান মে দিবস উপলক্ষে সম্মাননা স্মারক
গ্রহণ করছেন অবনী নীটওয়্যার লিঃ এর পক্ষে মাননীয় পরিচালক

ব্যাবিলন গণস্বাস্থ্য মেডিক্যাল সার্ভিসেস-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে
বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ

মেডিক্যালে চিকিৎসা সেবা নিচ্ছেন এলাকার সাধারণ মানুষ

ব্যাবিলন কথকতা-এর ২য় প্রকাশনা উৎসবে মোড়ক উন্মোচন
করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় ডীন ড. ফিরোজ আহমেদ
এবং GTZ-এর মিসেস আমিনা চৌধুরী

Dream Kidz-এর উদ্বোধনে কিশোর-কিশোরীদের
সাথে শিল্পী হাশেম খান

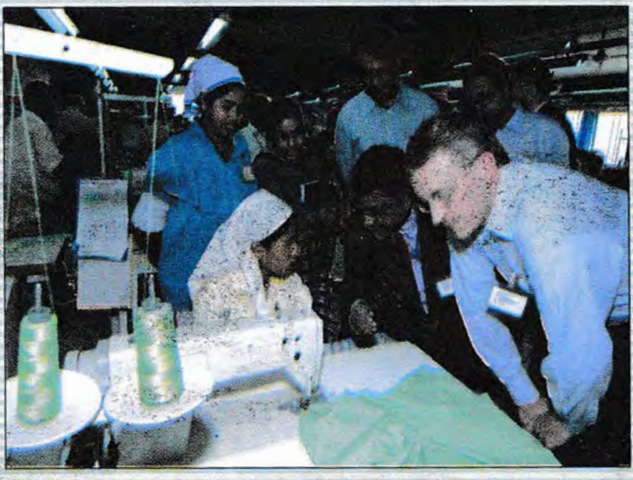

ব্রিটিশ মিনিস্টার Hillary Ben ব্যাবিলন পরিদর্শন করেন
২০০৫ সালের নভেম্বরে

ফিনিশিং ফ্লোরে জাপানী অ্যাম্বাসাডর Masayuki INOUE
এবং তার টিম (মার্চ ২০০৮)

ব্যাবিলন পরিবারের সকলের জন্য ন্যায্য মূল্যের দোকান

ট্রেনিং সেন্টারে হাতে কলমে শিক্ষারত শিক্ষানবীস

ব্যাবিলনের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের অংশগ্রহণে আয়োজিত
ক্রিকেট ম্যাচের ক্রিকেটারগণ

বাৎসরিক প্রীতিভোজের আনন্দময় একটি মুহূর্ত

আমাদের প্রতিষ্ঠান সমূহঃ

ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড
ব্যাবিলন ড্রেসেস লিমিটেড
সুরভী গার্মেন্টস লিমিটেড
অবনী ফ্যাশন লিমিটেড
অবনী টেক্সটাইল লিমিটেড
অবনী নীটওয়্যার লিমিটেড
জুনিপার এমব্রয়ডারীজ লিমিটেড
ব্যাবিলন ট্রিম্স লিমিটেড
ব্যাবিলন ওয়াশিং লিমিটেড
ব্যাবিলন প্রিন্টস
ব্যাবিলন ক্যাজুয়ালওয়্যার লিমিটেড
ট্রেন্ডজ্
ব্যাবিলন গণস্বাস্থ্য মেডিক্যাল সার্ভিসেস
ব্যাবিলন বায়িং সার্ভিসেস লিমিটেড

প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানাঃ
২-বি/১, দারুস্‌সালাম রোড, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬, বাংলাদেশ
টেলিফোন ঃ ৮০২৩৪৯৫-৬, ৮০২৩৪৬২-৩, ৮০১৩৪৪৯ (অফিস),
৯০০৭১৭৫, ৯০১০৫৩৩, ৮০১১০৮৯ (ফ্যাক্টরী), ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮০১৫১২৮
ই-মেইলঃ: babylon@babylon-bd.com
ওয়েব: www.babylongroup.com